প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ নাথ

নাথ ব্রাদার্স

২৩-সি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ

নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৬নং চা[illegible]

উপহার

অগ্রজ

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল, বি-এল্

করকমলে

বুকের আগুন

প্রভাতের কথা

সেদিন বাদ্‌লার বাজারে আমাদের মজলিস্‌টা আশাতীত রকম জমে গিয়েছিল। রসরাজ ভূপেন দাদা একটা মোটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গুড়গুড়ির নলটা মুখে লাগিয়ে এম্‌নি আষাঢ়ে গল্প জুড়েছিল যে, আমাদের সকলের মনের কোনোখানেই বোধ হয় সামান্য একটুও দুঃখ-অবসাদের ফাঁক পর্য্যন্ত ছিল না। অকালবৃদ্ধ দাদামশাই তাঁর পাতলা দেহখানাকে গুটিয়ে-সুটিয়ে ব'সে যেন গল্পের প্রত্যেক কথাটি উদরস্থ করছিলেন। আর সুশীল-ভায়া থেকে-থেকে এক-একটা টিপ্পনী কেটে বোধ হয় গল্পের জমাট রসটুকুকে খানিক তরল ক'রে নিচ্ছিল।

বাহিরে সারাদিনের অশ্রান্ত বর্ষণের পর আকাশ যেন একটু ক্লান্তির নিশ্বাস ছেড়ে নিচ্ছিল। সেই নিশ্বাসের সঙ্গে ফটকের ধারের হাস্‌না-হেনার ভিজা গন্ধটুকু যেন কার অযাচিত প্রীতির স্পর্শ আমাদের মাঝে বিলিয়ে দিচ্ছিল।

গল্প শেষ হ'তে দাদামশাই বল্লেন—কৈ হে প্রভাত, নাতবৌ কি চা'য়ের কথাটা ভুলেই গেলেন নাকি ?

সুশীল ভায়া ব'লে উঠল—আমার বোধ হয় চায়ের সঙ্গে আরও কিছু Serious রকমের বন্দোবস্ত ক'রে ফেলছেন। কিন্তু, না, শুধ্ধু চা হ'লেই চল্‌বে।

তার বল্‌বার ভঙ্গীতে সকলেই হেসে উঠল। হাসি থাম্‌তে-না-থাম্‌তে আমার ছোট বোন্ রেণু একখানা বড় কাঁসি ভ'রে কতকগুলা গরম সিঙ্গাড়া নিয়ে ঘরে ঢুক্‌তেই সুশীল মুখখানা অতিরিক্ত রকম গম্ভীর ক'রে ব'সে রইল। তার ভবিষ্যৎ বাণীর সফলতা দেখে সকলেই স্মিতমুখে তার পানে চাইতে লাগ্‌ল, আর সে গম্ভীরভাবে পা দুখানা নীরবে দুলিয়ে-দুলিয়ে যেন সকলের এই বিস্ময় এবং প্রশংসা মাখানো দৃষ্টিটুকু আকণ্ঠ উপভোগ করতে লাগল।

সিঙ্গাড়া ও চায়ের সৎকার যথাযথ শেষ হ'য়ে গেলে রেণু পানের রেকাবীটা তক্তার উপর রেখে দিয়ে দাদামশাইকে বল্লে—বৌদি আপনার সেই গানখানা শুন্‌তে চাচ্ছেন।

দাদামশাই বল্লেন—কোন্ গানখানা ?

আমি বল্লাম—কোন্‌খানা আর, আপনার সেই রেজেষ্টারী করা পেটেণ্ট গান,—"সেই নারী যে শীতল বারি—"! ও'গান শুনে আব ওঁর আশ মেটেনি। সেদিন আমায় বল্‌চে, দাদামশাইদের যখন ঝগড়া হয়, তখন বোধ হয় উনি ঐ গানখানি গেযে দিদিমার মানভঞ্জন করেন।

সকলেই হেসে উঠ্‌ল। দাদামশাই তখন হারমোনিয়ম নিয়ে তাঁর চাঁচা গলায় সুরু কর্‌লেন—

"* * *

নারী যে শীতল বারি, স্বরগ-অমিয়া-ঝারি,

নারী না রহিলে জগতে কি কভু ফুটিত সোণার ফুল!

* * *"

গানখানি কিন্তু শেষ হ'ল না। বাহিরে একখানা মোটর এসে থাম্‌ল ব'লে মনে হ'ল। আমি উৎসুক হ'য়ে উঠে বাহিরে যেতেই দেখি, অনেকদিনের পরিচিত মূর্ত্তি! সে ঘরে ঢুক্‌তে সকলেই একসঙ্গে অভ্যর্থনার স্বরে চেচিয়ে উঠলাম—আরে কেও, বিভাস যে?

বিভাস বর্দ্ধমানে ওকালতি করে, আমার বাল্যবন্ধু। এই অসময়ে—বাদ্‌লার এই স্যাঁতসেঁতে রাতে তাকে আমার বাড়ীতে পদার্পণ করতে দেখে আমার বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা রইল না। একটা চেয়ার টেনে তাকে বস্‌তে দিয়ে বল্লাম,—ব্যাপার কি? তুমি কোত্থেকে বলত? এ যে একেবারে—

সে বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—কেন, আস্‌তে নেই নাকি? আসল কথা, মক্কেলের কাজে একবার আস্‌তে হয়েছিল হাইকোর্টে—তা তোমাদের সঙ্গে দেখা করার লোভটা কিছুতেই সাম্‌লাতে পার্‌লাম না। হ্যাঁ, তোমাদের সব খবর কি বল? বাদ্‌লার বাজারে এ রকম আসর জমিয়ে বসেছ, আমার তো দেখে লোভ হচ্ছে।

আমি বললুম, কি করা যায় বল!—তা যাক্, তোমায় আজ এখানেই

থাক্‌তে হবে কিন্তু! আমি কাপড় চোপড় আনিয়ে দিই, ওসব ধড়া-চূড়ো ছেড়ে মানুষের মত হ'য়ে ব'সো।

বিভাস বল্লে—আচ্ছা, তার জন্যে তোমায় এত ব্যস্ত হ'তে হবে না; বোস দেখি।...আরে হ্যাঁ, তোমাদের বন্ধু শচীনাথের যে সেদিন বিয়ে হ'য়ে গেল; কৈ, তোমরা কেউ যাও নি?

সকলেই চম্‌কে উঠ্‌লাম। দাদামশাই বল্লেন—শচীনাথের বিয়ে?—কবে? কোথায়?

বিভাস বল্লে—আরে সেকি, তোমরা কেউ খবরই পাওনি নাকি?

আমি বল্লাম—কৈ না, আমরা তো কিছুই জানিনে!

তখন এই নিয়ে বেশ একটু উত্তেজনা চল্‌লো। অনেকেই বল্লে—এতদিন আইবুড় থাকার পর শচী এম্‌নি-এম্‌নি চুপি-চুপি বিয়ে ক'রে যে অপরাধ করেছে, তাতে তাকে রীতিমত একটা শাস্তি দেওয়া আবশ্যক।

আমি কিন্তু এই সব আলোচনায় যোগ দিতে পার্‌লুম না। আমার হাল্কা বুকের উপর হঠাৎ যেন কেমন একটা গুরুতর ভার বোধ হ'তে লাগ্‌ল। মুহূর্ত্তের মধ্যে এম্‌নি অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লুম যে, কারু কোন কথাই যেন আমার কাণে পর্য্যন্ত গেল না।

বিভাস বল্লে—কিহে, তুমি যে রাগের চোটে একেবারে গুম্ হ'য়ে ব'সে রইলে!

আমি আমার অবস্থা বুঝে অপ্রতিভ হ'লাম। জোর ক'রে মুখের উপর হাসি টেনে এনে আবার সকলের হাসি-ঠাট্টায় যোগ দেবার চেষ্টা কর্‌লুম, কিন্তু নিজেই অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লুম যে, আমার এই

কষ্টকল্পিত হাস্যরসের ধারা কোথাকার এক পাষাণবক্ষে পড়ে হাহাকারের মত ক্রন্দন ক'রে উঠ্‌তে চাচ্ছে! এ ভাঙ্গা মনখানাকে কিছুতেই যেন আর আমি জোড়া লাগাতে পারলুম না।...

বাদ্‌লার জমাট আসর যেন কেমন একটা অজ্ঞাত বিষাদের ভারে ভেঙ্গে গেল ব'লে মনে হ'ল। যে যার নিজের নিজের বাড়ী ফিরে গেল। রাত্রি দশটার ট্রেণে বাড়ী ফির্‌তে হবে ব'লে আমার অশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও বিভাস চলে গেল।

... ... সেই ভাঙ্গা আসরে আমায় একা বসে থাক্‌তে দেখে কিরণ ঘরে ঢুকে বল্লে—কি গো, তোমার কি এখনো গল্পের নেশা কাটল না?

আমি মুখ ফেরাতে সে বল্লে—এত হাসি-তামাসার পর হঠাৎ মুখ কালি করে বোসে রইলে যে? চল, খাবার দিয়েছি।... ...

আহারে বস্‌বার পর কিরণ আবার জিজ্ঞেসা কর্‌লে—বল না গা, কি মনের ভেতর তোলপাড় করচো?

আমি সংক্ষেপে শচীর বিয়ের কথা বল্‌তে কিরণ হেসে উঠ্‌ল। বল্‌লে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি? কি কথার কি উত্তরই দিলে! বন্ধু কর্‌লে বিয়ে, তা তার জন্যে তোমার আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার তো কোন কারণ নেই। তার ঢের আগেই তো তোমার বিয়ে হয়ে গেছে!

আমি বললুম—আহার-নিদ্রা বন্ধ না হোক্‌, তবু এর মধ্যে দুর্ভাবনার এমন একটা কারণ আছে, যা শচীর আর কোন বন্ধু জানে না, কেবল আমিই জানি।

সে কারণটা যে কি, তা জান্‌বার জন্য কিরণ পীড়াপীড়ি কর্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু আমি বল্‌লুম,—না, আজ নয় ; আজ্‌কের দিনে তার বিয়ের খবর শুনে সে সব আলোচনা ক'রে আর কাজ নেই। শুনো আর একদিন।

দিন দুই পরে ডাকযোগে একখানা চিঠি পেলুম। উপরের হাতের লেখা দেখেই বুঝলুম, চিঠি শচীনাথের। তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়ে ফেলে চিঠি পড়তে বস্‌লুম। মনে করেছিলুম, চিঠির ভেতর অনেক-কিছুই সে লিখবে। কিন্তু তা নয়, চিঠি ছোট। সে লিখেছে—

ভাই প্রভাত,

অনেকদিন তোমাদের খোঁজ-খবর পাইনি। তাতে তোমার চেয়ে আমার দোষটাই বেশী। তুমি বোধ হয় শুনে খুব আশ্চর্য্য হবে যে, মাসখানেক হ'ল আমি বিয়ে করেছি, অথচ, তোমাদের কাউকে একবার জানাইনি। না জানাবার কারণও একটু ছিল ভাই। তুমি যদি অবসর মত একবার আমার এখানে আস্‌তে পারো, তাহ'লে সকল কথাই শুন্‌বে ও বোধ হয় আমায় ক্ষমাও কর্‌তে পার্‌বে। বেশী কিছু লিখ্‌লাম না। পার তো নিশ্চয় এসো একবার। আশা করি, ছেলেমেয়ে নিয়ে তোমরা বেশ ভালই আছ।

—শচীনাথ।

চিঠি পড়ে আমার তখনই তার কাছে ছুটে যাবার ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু, ডাক্তারীর ব্যবসাতে একটা দুটো দিনের ছুটি করে ওঠাও যে কত শক্ত ব্যাপার, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না।

কাজেই, সপ্তাহখানেক বাদে একটু নিজেকে হাল্কা বোধ করে বর্দ্ধমানের দিকে রওনা হওয়া গেল।

শচীনাথ বয়সে আমার চেয়ে বছর তিনের বড়। শৈশবে দু'জনে একই পাড়ায় থাক্‌তুম, একই স্কুলে পড়শুনা কর্‌তুম। বর্দ্ধমান জেলায় বাড়ী হলেও সে বরাবর কল্‌কাতাতেই মানুষ হয়েছিল, কিন্তু তার পিতার মৃত্যু হওয়ার পর তার মায়ের একান্ত জিদে পড়ে বহুদিনের কল্‌কাতার বাস বর্দ্ধমানে উঠিয়ে নিয়ে গেল। তখন তার বয়স ২৬।২৭ বৎসর। তার বাপের পয়সা-কড়ি বেশ ছিল। আর সে-ই একমাত্র ছেলে। কাজেই রোজগারের ভাবনা করে হা-হা করবার প্রয়োজন তার বিশেষ কিছুই ছিল না।

আজ প্রায় আট-ন' মাস বাদে আমাদের এই দেখা। শচীনাথ তো মহা উৎসাহে আমাব অভ্যর্থনা করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে একখানা ইজি-চেয়ারে আমায় বস্‌তে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে—আমার শরীর কেমন দেখ্‌ছ বল ত ? আগের চেয়ে অনেকটা ভাল, না ?

যদিও তার শীর্ণ চোহারার উপর স্বাস্থ্যের উন্নতির বিশেষ কিছুই লক্ষ্য কর্‌তে পারা গেল না, তবু বাধ্য হয়ে বল্‌তে হ'ল, হ্যাঁ, আগের চেয়ে তো ভালই !...মা কোথায় ?

সে বল্‌লে—মা গেছেন পুরীতে রথযাত্রা দেখ্‌তে। এম্‌নি জিদ্‌

ধরলেন ভাই, কিছুতেই পেরে উঠলাম না। আবার আজ শুনছি, সেখানে কলেরার মহামারী বেশ জেঁকে বসেছে। এমনি উৎকণ্ঠায় আছি, তা আর তোমায় কি বল্‌বো ?

একটু চুপ করে থেকে বললুম—তারপর, বৌদিদি কোথায় ?

তার মুখখানা ক্ষীণ হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে তখনি যেন কালি হ'য়ে গেল। বল্‌লে, এইখানেই আছে ; দাঁড়াও, দেখি কি করচে ! ব'লে সে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেল।

খানিক পরেই সে দরজার কাছে এসে আমায় বল্‌লে, এস... ...

আমি তার পিছু-পিছু অন্য একখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কপাটের একপাশে কে একজন দাঁড়িয়েছিল, আমাদের দেখেই আর একটু আড়ালে সরে গেল। চোখ তুলে দেখি, একখানি নীলাম্বরী সাড়ীতে ঢাকা একটী তরুণী মূর্ত্তি !

শচীনাথ বল্লে—দেখেছ, এত করে বল্‌লুম, তবু সেই ঘোম্‌টা টেনে দাঁড়ানো ! পরে নিজেও যেন লজ্জায় একটুখানি ইতস্ততঃ করে বধূর কাছে গিয়ে বল্লে—শেষে এই হ'ল বুঝি ? প্রভাত আমার ছোট ভাইয়ের মত, তার কাছে তোমার লজ্জা করলে তো চল্‌বে না ! লক্ষ্মীটি, খোল ঘোম্‌টা—ব'লে নিজে হাতে সে বধূর মুখের কাপড়টুকু মাথার উপর তুলে দিলে।

চাঁদের সহিত সুন্দর মুখের তুলনা ঠিক হয় কি না জানি না, আর আমার কবিত্বের বাতিকও কোন কালেই বিশেষ ছিল না ; কিন্তু নীলাম্বরীর অবগুণ্ঠন-মুক্ত সেই মুখখানির পানে তাকিয়েই আমার মনে

হ'তে লাগল, যেন শরতের হাল্কা বাতাসে চাঁদের উপর থেকে একখানি নীল মেঘের আবরণ সরিয়ে দিয়ে গেল। বধূর রূপ দেখে শচীর সৌভাগ্যের তারিফ করতে ইচ্ছা হ'ল!

শচী বল্লে—নামটি কি শুন্‌বে? বল ত গা, নাম কি? ব'লে বধূর পানে চাইতে তার মুখ-চোখ আরও লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি বল্লুম—না, ও বেচারাকে আর কেন বিরক্ত করা! নামটা তো তোমার কাছ থেকেই শোনা যাবে! চল, আমরা বাইরে যাই!...

আবার আমরা শোবার ঘরে এসে বস্‌লুম। শচী বল্লে, না, চল, এবার বৈঠকখানায় গিয়ে বসি, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

দুজনে বৈঠকখানার তক্তপোশে এসে বসা গেল। একটু চুপ করে থেকে শচীনাথ বল্লে—বৌ কেমন দেখ্‌লে?

সুন্দর।

বয়েস ত কম নয়, বছর ষোল হবে। ব'লে একট চুপ করে থেকে হঠাৎ মুখ তুলে ব'লে উঠ্‌ল—সত্যি প্রভাত, মাঝে মাঝে তাই মনে হোচ্চে, ঝোঁকের মাথায় কি যে একটা কাজ করে ফেল্‌লুম—

আমি তার মুখের পানে চেয়ে কি বলতে গেলুম, কিন্তু হঠাৎ কোন কথাই আমার ঠোঁটের বাইরে আস্‌তে চাইল না।

শচী বল্লে, কেন যে তোমাদের—বিশেষতঃ তোমাকে এ বিবাহে খবর দিই নি, তা বোধ হয় এখন বুঝতে পারচ! কি জানি, কেমন ভয় হ'তে লাগ্‌ল ভাই! তুমি আমার শরীরের অবস্থা সবই জানো; তাই জেনেই এর আগে মা আমায় যতবার বিয়ের জন্মে পেড়াপীড়ি করেছেন, প্রতি বারই তুমি তাতে আপত্তি জানিয়েছিলে! কিন্তু এবার

আমায় এম্‌নি আচ্ছন্ন করে ফেল্লে যে, পাছে তোমাদের কাছ থেকে বাধা পাই, এই ভয়ে সকলকে লুকিয়েই উমাকে আমার ঘরে নিয়ে এলুম। কিন্তু, সব শুন্‌লে বুঝ্‌বে, আমার এ দুর্ব্বলতা বোধ হয় একেবারেই অমার্জ্জনীয় নয়।

কিছুদিন আগে আমাদের গ্রামে গিয়েছিলুম। আমার এক প্রতিবেশী, সম্পর্কে তাঁকে কাকা বলে ডাকি, তিনি একদিন এসে তাঁর এক ভাইঝির কথা পেড়ে বল্লেন যে, ঐ বাপ-মা-মরা মেয়েটীকে আমায় উদ্ধার করতেই হবে। আমি প্রথমেই হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলুম, এমন কি শেষে আমার এই মারাত্মক অসুখের কথাও বল্লুম, তবু তিনি নাছোড়বান্দা! তিনি বল্লেন—ও কথা আমি মানিনে বাবা! অসুখ আর কার কবে চিরকাল থাকে! আমার এই উপকারটুকু করলে ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমার ভাল হবেই হবে! এই আমি বলে রাখ্‌চি!...

ঠিক তার পরের দিন তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে উমার হাত ধরে আমার বাড়ীতে এসে হাজির! তোমার কাছে মিথ্যা বল্‌বো না ভাই, তার ঐ রূপ আর যৌবন দেখে আমার মনের ভেতর যেন সব ওলোট্‌-পালোট্‌ হ'য়ে গেল। তখন যেন একে একে অপর সকল কথা প্রাণের ভেতর হ'তে মুছে যেতে লাগ্‌ল। ঐ রূপের রাশি, যা অতি বড় ধনী, সর্ব্বগুণাধার পাত্রের হাতে গেলেও বেমানান্‌ হয় না, তাকে আমার এই জীর্ণ বুকের মাঝখানে নিয়ে কি কর্‌বো, একটা দারুণ রোগের বীজাণু যে আমার শরীরের ভেতর ধ্বংসের সূচনা করুচে,...এ সমস্ত কথা, এ সমস্ত বাধা বিপত্তির কথা কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। যুক্তি দিয়ে দিয়ে

আমি দিনরাত আমার মনের সন্দেহের অন্ধকারকে কাটিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌লুম। শেষে এম্‌নি অবস্থা দাঁড়াল যে, মনে হ'তে লাগ্‌ল, ঐ অমূল্য রত্নটিকে আমার এই চির-অন্ধকার ঘরের মাঝে জ্বালিয়ে যদি আর একটা বৎসরই আমি বাঁচি, তাও এই কারাগারের চিরস্থায়ী জীবনের চেয়ে ঢের বেশী প্রার্থনার বিষয়! ... ...

সিদ্ধান্ত করে ফেললুম, যেমন করেই হোক্, উমাকে আমি আমার করে নেব।...তাদের কথা দিয়ে ফেল্‌লুম, এবং পাছে দেরী হ'লে অপর কোন সৌভাগ্যবান্ পাত্র এসে তাকে আমার ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাই এক সপ্তাহের মধ্যেই চুপি চুপি পুরোহিত ডেকে বিবাহ-কার্য্য সেরে ফেল্‌লুম। ধুমধাম হ'ল না বলে মা কান্নাকাটি করলেন, কিন্তু আমার আর এর বেশী এগুতে সাহস হোল না, কেবল তোমার ভয়ে; কেন না, স্বেচ্ছায় এই বিষ খেতে যাওয়ার পূর্ব্বে তুমি জান্‌তে পার্‌লে যে সাধ্যমত বাধা দেবে, তা আমি ভাল-রকমই জান্‌তুম।......

শচীর কথা শুনে আমার বুকের ভিতরও যেন কে হাহাস্বরে ক্রন্দন সুরু করে দিয়েছিল। দুই হাতে মুখ চোখ ভাল করে রগ্‌ড়ে নিয়ে বল্‌লুম—আগে জান্‌লে হয় ত বাধা দিতুম; কিন্তু এখন যখন সে অবস্থা পার হ'য়ে গেছে, এখন ওসব মনে করে কোন লাভ নেই। কে জানে, মনের আনন্দে একটু বিশেষ সাবধান হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌লে শরীর তোমার চিরদিনের জন্য সুস্থও হ'য়ে যেতে পারে।

শচীর মুখখানা যেন অনেকখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বল্লে—পারে? সত্যি বল্‌ছ, তা সম্ভব? তুমি ডাক্তার, ডাক্তারের মত বল,

আমাকে আশ্বাস দেবার জন্যে ব'ল না! তুমিই তো একদিন বলেছিলে, এ রোগ শিবেরও অসাধ্য!

রীতিমত মুস্কিলে পড়ে গিয়ে বল্‌লুম—না, তা ঠিক আমি বলিনি! তবে, আমি বলেছিলুম, এই যক্ষ্মা রোগটা সারানো ঠিক আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রের সাধ্যায়ত্ত নয়। ফাঁকা বাতাস আর মনের স্ফুর্ত্তিতে এ রোগ যে সারে না, একথাও ঠিক জোর ক'রে বলা চলে না! কিন্তু, সাবধানে নিয়মে থাকাই হচ্চে এর প্রধান চিকিৎসা!

শচী অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লে—কিন্তু এই মাস পাঁচ-ছয় আমি বেশ আছি; শরীরে কোন রকম অসুখ আছে বলেই তো মনে হয় না! দেখ্‌বে একবার বুকটা?

—আচ্ছা দেখ্‌ব এখন, তাড়াতাড়ি কি?

—না ভাই, দেখ না একবার! আমি সব জানি, সব বুঝি যে শরীরের আমার কোন গোলমাল নেই; তবু এই বিয়ে করার পর থেকে কেবলই মনে হয়, কখন্ কি যেন এই বুকের ভেতর হ'য়ে যাচ্ছে! তোমার ষ্টেথোস্কোপ ত' সঙ্গেই রয়েছে, দেখ না ভাই একবার!

এখন এই অবস্থায় এই যন্ত্রপাতি নিয়ে তার বুক পরীক্ষা করতে ব'সে যাওয়ার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তবু তার এই দুর্ব্বল শিশুর মত কাতর অনুরোধ আমার কাছে অলঙ্ঘ্য বোধ হ'ল। জামার পকেট হ'তে ষ্টেথোস্কোপটা বার ক'রে তার বুকে লাগিয়ে পরীক্ষা সুরু করলুম। বার-বার সে আমায় রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করতে লাগ্‌ল—কেমন দেখ্‌চ?

আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম—ভাল।

সে বল্লে—সেটা কেমন দেখ্‌লে? খুব বেশী বেড়েচে কি?

—কৈ, না!—আঃ ও রকম ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে না। দেখ্‌তে দাও ভাল ক'রে।

ধমক খেয়ে সে একটু সুস্থির হ'য়ে বস্‌ল। আমি বুক ও পীঠ ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে লাগ্‌লুম।

হঠাৎ পিছনদিকে খট্‌ ক'রে কিসের শব্দ হ'তে আমি মুখ ফিরিয়ে দেখি, বাড়ীর দিকে সিড়ির ধারে যে জানালা ছিল, তারই কপাট দুখানা ঈষদুন্মুক্ত, আর সেই ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে কার যেন দুটো উজ্জ্বল চক্ষু ঠিক আমার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে!

আমার হাত থেকে ষ্টেথোস্কোপটা খসে পড়ে গেল। হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনটুকু পর্য্যন্ত যেন হঠাৎ নিঃশব্দ এবং আড়ষ্ট হ'য়ে গেল। শচী আমার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল; মুখ ফিরিয়ে বল্লে—কি, দেখ্‌ছ না?

ষ্টেথোস্কোপ তুলে নিয়ে কোঁচার খুঁটে মুখ-চোখ মুছে বল্লুম—হাঁা, দেখা হ'য়ে গেছে। এখনকার অবস্থা বেশ ভালই!

—আর সেটার কথা তো বল্‌লে না ভাই! সেই যক্ষ্মার—

তাড়াতাড়ি তাকে ধমক দিয়ে বলে উঠ্‌লুম—নাঃ, তোমার সঙ্গে ব'কে ব'কে আর পারা গেল না দেখ্‌চি!

শচী ভয়ে ভয়ে বল্‌লে—না, তুমিই তো বলেছিলে ভাই যে,—

আমার ভয়ানক রাগ বাড়্‌ছিল।

আমার মাথা আর মুণ্ডু বলেছিলুম। আমি শুধু বলেছিলুম,—তোমার heartটা বড্ড weak ; এই পর্যন্ত !

আর একবার জানলাটার পানে চেয়ে দেখতে ভারী ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু শচীর চোখের সামনে বসে সে ভরসাও আমার হ'ল না।

উমার কথা

কি দারুণ অভিশাপের লিখন কপালে একে নিয়ে আমি এ জগতের মাঝে এসেছিলুম, মনে করতে আজও শিউরে উঠি। আমাকে প্রসব করার পরই মা আমার সেই যে রোগে পড়লেন, দু'মাসের মধ্যেই তাঁকে এ সংসারের মায়া কাটিয়ে যেতে হ'ল। সেই এক মাসের খুদে মা-খাকী মেয়েটাকে কোন্ মা আবার আদর করে বুকের রক্ত খাইয়ে বাঁচিয়ে তুললে, তা ঠিক জানিনে; শুনেছি, তিনি আমার পিসিমা; আমার জ্ঞান হবার আগেই তিনিও বিদায় নিয়েছেন। রাক্ষসীর মত এই দু-দুটী মাকে খেয়ে আমি কিন্তু দিব্যি বছরের পর বছর বেড়ে চলতে লাগলুম। কেউ কেউ আমায় দেখে 'আহা' বলে সমবেদনা জানাতো, আবার কেউ-কেউ আমায় কুলক্ষণা বলে তিন হাত তফাতে সরে যেত!

কলকাতায় আমি আমার বাপের কাছে মানুষ হয়েছিলুম;

সেখানে মেয়ে-ইস্কুলে পড়্‌তে যেতুম, গুরুমা আমায় বড্ড ভালবাস্‌তেন, আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি আর ফুটফুটে চেহারা দেখে। বাবা আমাকে মায়ের চেয়েও আদরে যত্নে রেখেছিলেন, কিন্তু আমি যখন বারো বছরের তখন তিনিও সরে গেলেন। আমি তখন গিয়ে পড়লুম আমার কাকাবাবু আর কাকীমার কাছে!

কাকীমায়ের কোলের খোকাটীকে নেবার মানুষ ছিল না, তা ছাড়া কাপড়-কাচা ঝাটপাট দেওয়া, একসঙ্গে এতগুলো কাজ আমাকে দিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে তাঁরা আমাকে খেতে-পরতে দিতে 'কিন্তু' করলেন না। কিন্তু বছরের সঙ্গে আমার বয়েসটাকেও তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেড়ে চল্‌তে দেখে ক্রমশঃ তাঁরা আমার উপর খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। আরো বেশী জ্বলে উঠ্‌লেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার রূপের নদীকে দুকূল ছাপিয়ে উঠ্‌তে দেখে! নানান্ লোকের নানা কথা শুনে কাকীমা একদিন স্পষ্ট শাসিয়ে দিলেন, এই ঘর-জ্বালানো রূপের আগুন নিয়ে বাড়ীর বাইরে ঘুরে বেড়ালে চিরদিনের জন্যে আমাকে কুলের বাইরেই থেকে যেতে হবে। অতএব এখন হ'তে আমার উপর বাড়ীর ভেতরে থেকে সেখানকার যত-কিছু কাজ-কর্ম্ম কর্‌বার ফর্‌মাস হ'ল।... ...

কথায় বলে, ছেলে আইবুড় থাকে, তবু মেয়ে আইবুড় থাকে না। মেয়ে জন্মাবার অনেক আগে থেকেই ভগবান্ যে তার বর গড়ে রেখে দেন!...আমার বিয়ের কথা উঠ্‌লেই পাড়ার গিন্নীর দল এই বলে কাকীমাকে সান্ত্বনা দিতেন। তা দেখ্‌লুম, কথাটা মিথ্যে নয়! তা নইলে, আমার মত পোড়াকপালীর কপালেও শেষ পর্য্যন্ত বর ত জুট্‌ল!

কাকা আর কাকীমা আমায় সঙ্গে করে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে আমায় দেখাবেন বলে। তিনি আমায় দেখ্‌লেন, আমিও দেখ্‌লুম তাঁকে। দেখেই মনে হ'ল, এ তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে; কিন্তু পরে শুন্‌লুম, তা নয়! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এত বয়স হয়েছে, তবু এখনো তিনি বিয়ে করেন নি! মনে হ'ল বুঝি আমাকে উদ্ধার করতে হবে বলেই তিনিও এতদিন আইবুড় রয়ে গেছেন!... ...

বিয়ে হ'য়ে গেল।... ...

ফুলশয্যার রাত্তিরে বেশ ভাল ক'রে তাঁকে দেখ্‌লুম। তাঁর আদরে আমার সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। তাঁর কোলের উপর ব'সে বুকের উপর মুখখানি লুকিয়ে রেখে গভীর তৃপ্তিতে আমার দুটী চোখ মুদে এল'। মনে মনে বল্লুম—আমার কপালে এত সোহাগ সইবে তো ভগবান?... ...

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, কেন এতদিন তিনি বিয়ে করেন নি! তিনি মুচকি হেসে বল্লেন—এতদিন তোমাকে খুঁজে পাইনি বলে। এই একটী কথা আমার কাণের ভেতর দিয়ে সারা দেহের প্রতি অণুতে অণুতে যে কি সুধার ধারা ছড়িয়ে দিলে, তা প্রকাশ ক'রে বল্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। মনে মনে বল্লুম, হে হরি! চিরদিনের অলক্ষণাকে একদিনে এ কি সৌভাগ্যের সিংহাসনে বসিয়ে দিলে?

বিয়ের আট দিনের পর মাত্র ক'টা দিন কাকীমায়ের কাছে থেকে আবার শ্বশুরবাড়ী এলুম। কথায় কথায় তিনি একদিন বল্লেন—মা পুরী যাচ্ছেন; তোমার একা থাক্‌তে কষ্ট হবে বোধ হয়? বাপের বাড়ী যাবে?

আমি তাঁর মুখের পানে চাইলুম ; আস্তে আস্তে বল্‌লুম, আমার তো বাপের বাড়ী নেই !

তিনি হঠাৎ কোন কথা কইতে পার্‌লেন না। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমার বাপ-মা কেউ নেই। তোমায় ছেড়ে যাবার মত ঠাঁই তো আমার কোথাও নেই, কোথাও আমি যাবো না।

কথাটা ব'লে নিজেরই কেমন লজ্জা হ'ল! হয়ত' তিনি ভাব্‌বেন, কি বেহায়া আমি! তখনি কিন্তু মনে মনে বল্‌লুম—কেনই বা বল্‌বো না! যা সত্যি, স্বামীর কাছে তা বল্‌বো না তো কার কাছে বল্‌বো! স্বামীর কাছে এটুকু জোর খাটাবো না তো কার কাছে খাটাবো!

তিনি যেন খানিকক্ষণ কেমন গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলেন। আমি আদর করে তাঁর গলাটি জড়িয়ে ধরে বল্‌লুম—তুমি রাগ করলে আমার ওপর? তুমি যদি যেতে বল, তাহ'লে আমি যাবো ; কিন্তু সত্যি কথ আমি বলেছি।

তিনি এক মুখ হেসে আমার গালের উপর চুমু দিয়ে বল্‌লেন—কখ্‌খনো না, তুমি এইখানেই থাক্‌বে, এইখানে—এই আমার বুকের মাঝখানটিতে... ...

মা চলে গেলেন। আমরা দুটীতে বাড়ীর ভিতর রইলুম। তিনি একজন রাঁধুনী রাখতে চাইলেন, আমি দিলুম না। মনে-মনে বল্‌লুম—নিজে হাতে রেধে তোমায় খাইয়ে যে কি সুখ, তা তুমি কি বুঝবে!

বাড়ীর ভেতর দুটী মানুষ ; কিন্তু এই দুটী মানুষের মধ্যেই নিজেকে গিন্নীর আসনে বসিয়ে রাজত্ব করার যে কি সুখ, তা যেন আমি আমার

সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে অনুভব করতে লাগলুম। সময়ে-সময়ে নিজের মনে হাসতুম আর বলতুম—মুখেই বলি আমরা মেয়ে মানুষ স্বামীর দাসীবৃত্তি করে যাচ্ছি, কিন্তু এই যদি দাসীবৃত্তি হয়, তাহ'লে এ দাসীবৃত্তির অধিকার কোন্ মেয়ে মানুষ যে ঝেড়ে ফেলতে চায়, তা বলতে পারি না। উঃ, বিয়ের পর এই একটা মাস যেতে-না-যেতে কি হুকুমটাই করে নিচ্ছি, ঐ নিরীহ গোবেচারী লোকটীর উপর! আমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে—আমার মুখে হাসিটী ফুটিয়ে তোলবার জন্যে বেচারা কি না করচে! রাজরাণীর খাতির—রাজরাণীর হুকুমের দাম কি এর চেয়েও বেশী!

মাঝে-মাঝে যদি বলতুম—আমাকে নিয়ে তুমি বড্ড ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছ, না?

তিনি তাড়াতাড়ি বলতেন—কেন, কেন! তোমায় নিয়ে যে আমি কত সুখী, তা কেবল আমিই জানি! এত সুখের আশা ছিল ব'লেই এতদিনের পর বিয়ের ভূত আমার ঘাড়ে চেপেছিল!

আমি যদি জিজ্ঞাসা করতুম—কেন, তোমার কি বিয়ে করবার মৎলবই ছিল না? তিনি একটু ইতস্ততঃ করে বলতেন—হাঁ, অনেকটা তাই!

আমি নাছোড়বান্দার মত বলতুম—কেন, বল না? তুমি তো বংশের একটী মাত্র ছেলে!

আমার জেরার চোটে তাঁর মুখখানা যেন কেমন বিবর্ণ হয়ে যেত। কোন রকমে আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে ব'লতেন—তা হোক্, আমাদের এ ছোট খাট বংশের নাম লোপ হ'লে কি-ই বা এমন ক্ষতি

হ'য়ে যাবে!.........না, ওসব ছেলেপুলের কামনা আমার একদম নেই—একদম না—

কি-জানি-কেন আমার এ কথাগুলো কেমন ভাল লাগ্‌তো না. আমার মুখ ভার দেখে তিনি অন্য কথা পেড়ে আমাকে হাসাবার চেষ্টা করতেন। তাঁর এই ছেলেমানুষী দেখে আমার রাগ-অভিমান এক মুহূর্ত্তে কোথায় বাষ্পের মত উবে যেত।

বিয়ের সময় তাঁর বন্ধুবান্ধব একজনকেও দেখিনি। একদিন জিজ্ঞাস করায় বলেছিলেন—বন্ধুবান্ধব অনেক, তবে, তাড়াতাড়িতে বিয়ের সময় কারুকে বল্‌তে পারি নি। এই সব বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে একজনের নাম তাঁর মুখে প্রায়ই শুনতুম; তিনি কল্‌কাতার একজন বেশ ভাল ডাক্তার।

একদিন বল্লেন, প্রভাতকে এখানে আসতে লিখে দিয়েছি; তোমাকে কিন্তু তার সামনে বেরুতে হবে, কথা কইতে হবে। তাকে লজ্জা ক'রে স'রে থাক্‌লে চল্‌বে না।

আমি প্রথমে একেবারেই রাজী হই নি। কিন্তু তাঁর পেড়াপীড়ির কাছে আমার এ জেদ টিক্‌ল না।

প্রভাতবাবু এলেন।

উনি আমায় একখানি নীলাম্বরী সাড়ী পরে তৈরী হ'তে বল্লেন। আমার এম্‌নি লজ্জা করতে লাগ্‌ল! মাগো! এত বড় মেয়ে, এখন কি আবার এমনি করে' সেজেগুজে ক'নেটি হ'য়ে বসা যায়! কিন্তু তাঁর কথা প্রাণ থাক্‌তে আমি ঠেল্‌তে পারলুম না। তা'হলে যে আর কৃতঘ্নতার সীমা থাক্‌বে না! আমার জন্যে তিনি কি না করছেন!

কিন্তু তাঁদের আস্‌তে দেখে মাথার কাপড় যেন আপনি মুখে নেমে গেল। তাতেই কি ছাই বেহাই আছে? তিনি নিজে এসে আমার মুখের ঘোম্‌টা খুলে দিলেন। মাগো, এম্‌নি জেদী মানুষ, লজ্জা-সরম আর কিছু রাখ্‌তে দিলে না!......

বৌ-দেখা হয়ে গেলে দু'বন্ধুতে গিয়ে বৈঠকখানায় বস্‌লো। যাবার সময় তিনি বন্ধুর জন্যে জলখাবারের যোগাড় করতে ব'লে গেলেন। আমি ভাঁড়ার ঘরে বঁটি নিয়ে আম বোনাতে ব'সে চাকরাণীকে দিয়ে ভাল সীতাভোগ আর মিহিদানা আন্‌তে পাঠালুম। জলখাবার ঠিক ক'রে আমি সিঁড়ির ধারের সেই জানালাটার কাছ থেকে বৈঠকখানার পানে উঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগলুম, কি হচ্ছে কর্ত্তাদের! তা সে কত কি ছাই কথা, তার কতক শুন্‌তে পাচ্ছি, কতক পাচ্ছি না; আবার যা-ও শুন্‌তে পাচ্চি, তার ঠিক মানেও বোঝা যাচ্ছে না। শেষে দেখি, ওমা, ডাক্তারবাবু তাঁর বুক-দেখা যন্ত্রটা বের ক'রে ওঁর বুকে লাগিয়ে দেখ্‌তে সুরু করলেন!...আমার বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল। কেন? কি হ'য়েছে ওঁর?

অসুখ করেছে? বুকে সর্দ্দি বসেছে বুঝি? কৈ, আমায় তো কিছু বলেন নি? কেন, কেন বলেন নি আমায়? আমার চেয়ে কি ওঁর বন্ধু বড় হোল? বুকের ভেতর যেন কি একটা জিনিস পাক দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, মনে হ'ল, এখুনি আমার চোখ ফেটে জল বেরুবে!

প্রভাতবাবু তাঁর পিঠটা দেখ্‌তে-দেখ্‌তে একবার আমার পানে চেয়ে দেখ্‌লেন। তখন আমার সেখান থেকে সরে যাওয়া দূরে থাক্‌, চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল,—কি হয়েছে ওঁর, কি হ'য়েছে?

খানিক পরে স্বামী বাড়ীর ভেতর এসে বল্‌লেন,—কৈগো, প্রভাতকে জলখাবার দিলে না?

অভিমানে আমার ঠোঁটদুটো এমনি কাঁপছিল যে, সে অবস্থায় কোনো কথা বল্‌তে গেলেই হয়ত' হু-হু ক'রে চোখের জল বুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ত।

স্বামী বল্‌লেন—কথা কচ্ছ না যে? খাবার আনা হ'য়েছে?

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম যে সব তৈরী।

তিনি আর কোন কথা না ব'লে বাইরে গিয়ে প্রভাতবাবুকে সঙ্গে ক'রে ভেতরে নিয়ে এলেন। জল-খাবার আমি আগে থেকেই ঘরের ভেতর সাজিয়ে রেখেছিলুম।

আমার আর সেদিকে যেতে পা উঠ্‌ল না। দালানের এক ধারে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। খানিক পরে উনি কাছে এসে বল্লেন—শুনছ গা, প্রভাত বলছে, আজই সে চলে যাবে।

আমার বড় রাগ হ'ল। ব'লে ফেল্লুম—তার আমি কি কর্‌ব?

উনি একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লেন—বাঃ, এই বুঝি? তুমি ওকে বল, আজ্‌কের দিনটা থাক্‌তে!

আমি পার্‌বো না।

বোধ হয় আমার কথার ঝাজে তিনি স্তব্ধ হ'য়ে পড়লেন। তারপর আর একটু দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে-আস্তে ঘরে ফিরে গেলেন।

......সন্ধ্যার ট্রেণে প্রভাতবাবু কল্‌কাতায় চ'লে গেলেন। স্বামীও নিশ্চয় আমার উপর রাগ করেছেন বুঝ্‌তে পারলুম, কেন না, তখন

থেকে তিনি আমার সঙ্গে বড়-একটা কথা কচ্ছেন না। পাছে কথা কইতে হয়, সেই ভয়ে যেন কাছেও ঘেঁস্‌চেন না।

রাত্রে শোবার ঘরে গিয়ে আমি মেঝের উপর শুয়ে পড়লুম। তিনি পালঙ্কের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে যেন তন্ময় হ'য়ে কি ভাব্‌ছিলেন। চমক ভেঙ্গে উঠে বসে বল্লেন—ও কি, মেঝেয় শুলে কেন? উঠে এস!

তিনি নেমে এসে সাধাসাধি না করা পর্য্যন্ত আমি কিন্তু তেম্‌নি পড়ে রইলুম, কথাও কইলুম না। শেষে তিনি আমার হাত ধরে উঠিয়ে বল্‌লেন—আমি তোমার কি করেছি, তা তো জানি না! কেন তুমি রাগ ক'রেছ, আমায় বল্‌বে না?

আমি উঠে বসে জোর দিয়ে বললুম—না, বল্‌বো না। তুমিই কি আমায় সব কথা বল?

—কেন, আমি তোমায় কি না বলিচি, বল!

—তবু বল্‌চ, 'কি না বলিচি!' তোমার সর্দ্দি না কি হয়েছে, সে কথা কল্‌কাতা হ'তে এসে বন্ধু জেনে গেল, আর আমি একবার টেরও পেলুম না!

তিনি যেন একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন! তারপর বল্লেন—কৈ, সর্দ্দিটর্দ্দি তো আমার কিছু হয় নি!

আমার এম্‌নি রাগ হচ্ছিল, কি বল্‌বো! বল্লুম—না, আমার হয়েছে। তাই তখন বন্ধুকে দিয়ে বুক দেখানো হচ্ছিল! বলে আমি খুব রাগ করে পালঙ্কের উপর বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লুম।

অনেকক্ষণ তিনিও কিছু বল্‌লেন না, আমিও কিছু বললুম না। ঘরটা যেন কেমন এক বিশ্রী রকম স্তব্ধ হ'য়ে রইল। আর সেই

স্তব্ধতার মাঝখানে তাঁর নিশ্বাসের টানা শব্দটা যেন আমার কাণে গোমরাণো কান্নার মত মনে হ'তে লাগল। ভারি ভয় হ'ল। রাগ-অভিমান সব ভুলে আমি সরে এসে তাঁর পা দুখানির উপর মুখখানা চেপে ধরলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমার দুচোখ হ'তে জলের ধারা আপনা আপনি বেরিয়ে এল।

ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে তিনি আমাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে বল্লেন—কি মুস্কিল! সত্যি বল্‌চি, কিচ্ছু আমার হয়নি, সর্দ্দি-টর্দ্দি কিচ্ছু হয় নি।

আমি আর কোন কথা বল্‌তে পারলুম না। সেইখানে—তাঁর বুকের উপর মাথাটি রেখে সেই যে পড়ে রইলুম, নড়বার-চড়বার ইচ্ছা পর্য্যন্তও আর হ'ল না।

*　　　*

*

দিন দুই পরে হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! টেলিগ্রাম এল, পুরীতে শাশুড়ী কলেরায় মারা গিয়েছেন। টেলিগ্রাম পড়ে উনি ত ছেলেমানুষের মত ডুকরে কেঁদে উঠ্‌লেন। তখন কি মুস্কিলেই যে আমি পড়লুম, কি বল্‌বো! এ দারুণ শোকে আমি ওঁকে কি বল্‌বো, কি বলে ওঁকে সান্ত্বনা দেবো!

সারা বেলাটা ধরে দু'জনে মিলে শুধু কাঁদলুম।

পাড়ার পাঁচজনে এসে তাঁকে অনেক কষ্টে শান্ত করে তুল্‌লে। পাশের বাড়ীতে একজন গিন্নী থাকৃতেন, শাশুড়ীর সমবয়সী, তাঁরাও

ব্রাহ্মণ; তিনি এসে আমায় যা-যা করতে হবে সব ব'লে ক'য়ে দিলেন।...

একটী একটী করে দশটা দিন যে কেমন ক'রে কাট্‌ল, তা জানি না। এই দশদিনের মধ্যেই তাঁর শরীর যেন শুকিয়ে আধখানা হ'য়ে গেল। সেদিন তাই বলছিলুম, একটু বেশী করে ঘি দুধ খাও তুমি! ক'দিনে কি হ'য়ে গেছ দেখ তো!

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—আর খাওয়া উমা, এ শরীরের হাড়কখানাও কবে হয়ত' এমনি খ'সে পড়ে যাবে, তাতেই কি কিছু আশ্চর্য্য আছে!

আজ এ কথায় আমার রাগ হ'ল না। দুটী চোখ দিয়ে নীরবে জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি দেখে বল্লেন—কাঁদছ কেন উমা? মানুষের বাঁচা মরার কারখানা তো এই দেখ্‌চ? সব সময়ে নিজেকে চরম বিপদের জন্যে তৈরী রাখা ভাল, তাহ'লে আর একটা কিছু হ'লে এমনি ক'রে ভেঙ্গে পড়তে হয় না!

এ কথার ভিতরও যে একটা গভীর ইঙ্গিত ছিল, তা সেদিন টের পাইনি, পরে বুঝতে পারলুম। সেদিন না বুঝে শুধু বলেছিলুম—আচ্ছা, তুমি অত বকোনো তো! নিজের শরীরটার উপর লক্ষ্য ক'রে চল'।

তিনি আর কোন কথা না বলে চুপ ক'রে গেলেন।

মায়ের শ্রাদ্ধের কাজ একরকম ক'রে চুকে গেল। বাড়ীতে মেয়েদের মধ্যে বল্‌তে গেলে আমি একাই! তবে আমার কাকীমা আর কাকীমার ছেলেমেয়েরা এসেছিল। আমার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে ওঁর এক জ্যাঠামশাই আছেন। তাঁরা কিন্তু আস্‌তে পারেন নি।

বুকের আগুন

প্রভাতবাবু আর ওঁর অন্য বন্ধু বান্ধবও অনেকে এসেছিলেন। প্রভাতবাবুর একটী ভাই আছে, শুনলুম—তার নাম নিশীথ। সেও এসেছিল। আমি তাঁদের সকলকে আলাদা একটা ঘরে নিজে পরিবেশন করে খেতে দিলুম।... ...

গোলযোগ সব মিটে গেলে সেদিন রাত্রে স্বামী বল্লেন—প্রভাতও কাল বলছিল বটে, শরীরটা হঠাৎ যেন বড্ড কাহিল হ'য়ে পড়েছে!

আমি রাগ ক'রে বললুম—এতক্ষণে ঠিক বিশ্বাস হ'ল তো? প্রাণের বন্ধুটী না বল্লে আমাদের কথায় বুঝি বিশ্বাসই হয় না?

তিনি মুচকি হেসে বল্লেন—না গো না; অমনি রাগ হ'য়ে গেল? প্রভাতের ওপর তোমার হিংসে হয় না কি?

—তা কেন হবে না? আমার চেয়ে সে যে তোমার বেশী আপনার!

—পাগল! তবে সে ছেলেবেলার বন্ধু!

—স্বামী-স্ত্রীর যে সম্বন্ধ, সেও তো বন্ধুত্বের চেয়ে ছোট নয়, বরং ঢের বড়। শাস্ত্রে বলে শুনিচি, স্ত্রী স্বামীর সচিব, সখি, শিষ্যা, আরো কত কি! তা তোমরা আমাদের সখী বলেই স্বীকার কর্ত্তে চাও না, তার আবার সচিব!

তিনি আমার কথায় হেসে গভীর আদরে বুকে টেনে নিয়ে বল্লেন, তুমি তো আমার সচিব, সখী, আমার সর্ব্বস্ব! আমার যেখানে যা কিছু সব তোমাতে পূর্ণ! তোমার কাছে অনেকদিন তো আমি নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি উমারাণি!

তার আদরের উত্তাপ লেগে যেন আমার সারা মুখ-চোখ তেতে উঠল।

দিন-তুই পরে সেদিন বিকালবেলা কাপড়চোপড় কেচে গা-ধুয়ে ওপরে এসে দেখি, উনি সেই অবেলায় পালঙ্কের উপর ব'সে মুখখানাকে একটা তাকিয়ার উপর গুঁজে রয়েছেন। আমি কাছে এসে জোর ক'রে মুখখানা তুলে ধ'রে বললুম—কি হ'য়েচে? এমন ক'রে ব'সে যে?

হাতখানা তাঁর কপালের উপর ছিল, গা'টা যেন একটু গরম ব'লে মনে হ'ল। ভাল ক'রে কপালে বুকে হাত দিয়ে বললুম—শরীর খারাপ হয়েছে বুঝি?

তিনি বল্লেন—হাঁ, বোধ হয় একটু হ'য়েছে। চোখটাও জ্বালা করছে একটু। এই ক'দিনই—

বলেই হঠাৎ চুপ করে যেতে আমি বল্লুম—ক'দিন ধরে' কি হয়েচে?

—না, কিছু না। বল্‌ছিলুম, মায়ের কাজের সময় ক'দিন বড় খাটুনী হয়েছে কি না, তাই আজ একটু জ্বরটা ফুটেছে!

......ভোরের সময় এই জ্বরটুকু ছেড়ে গা'টা বেশ জুড়িয়ে গেল; কিন্তু বিকেল হ'তে না হ'তে দেখি, আবার একটু জ্বর এসেছে।

আমি বল্লুম—আজও আবার জ্বর ফুটেছে তো! শীত করচে?

তিনি আমার মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। দুটী চোখ যেন ছল্ ছল্ ক'রে জলে ভরে এল বলে মনে হ'ল। তারপর খুব তাড়াতাড়ি তিনি মুখ ফিরিয়ে চোখ দুটো রগ্‌ড়ে নিলেন।

আমি বল্লুম—চোখ দুটো কি বড্ড বেশী জ্বালা করচে?

তিনি বল্লেন—হাঁ।

সন্ধ্যার সময় আমায় বল্লেন—একটী কাজ করবে?

—কি?

—ঐ ছোট খাটটায় আমায় একটা বিছানা করে দাও, আর তুমি এই খাটে শোও!

কিছুই না বুঝে বল্লুম—কেন?

তাঁর উত্তর দিতে দেরী হ'তে লাগ্‌ল। আমি বল্‌লুম—তোমায় আমি কাল খুব বিরক্ত ক'রেছিলুম বুঝি? আচ্ছা, আমি না-হয় এই মেঝেতে শুই—

তিনি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—না না, তা কি হয়! পরে যেন হতাশ ভাবে নিজের মনে-মনে ব'ল্লেন—জানি তুমি শুন্‌বে না, তুমি রাগ কর্‌বে!

তাঁর পানে চেয়ে-চেয়ে তাঁর মুখ-চোখের ভাব যেন কেমন-কেমন মনে হ'তে লাগ্‌ল। হঠাৎ আজ যেন মনে হ'ল, কাল যা' দেখেছি, ও-বেলা যা' দেখেছি, তার চেয়ে যেন ওঁকে এখন ঢের—ঢের রোগা দেখাচ্ছে! প্রাণের ভিতর হঠাৎ যেন কেমন করে উঠ্‌ল! যেন কি একটা অজ্ঞাত হতাশায় দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। কেন উনি এমন হ'য়ে যাচ্ছেন! এত রোগা ত ছিলেন না? আর এই সামান্য জ্বরে এত ব্যাকুলই বা কেন হয়েছেন?

তাঁর হাত দুখানা টেনে নিয়ে বল্লুম—কেন—কেন তুমি ও-সব কথা বল্‌ছ? কি তোমার হয়েছে? সামান্য জ্বরই তো? জ্বর কি কারও হয় না? তার জন্যে তুমি দিনরাত কি ভাবচ? আমায় বল্‌তে হবে—বল—বল্‌বে না আমায়?

কথার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞাতে আমার দুটী গাল গড়িয়ে চোখের জল নেমে পড়ল। তিনি কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন—ছিঃ অমন

ক'রো না, ওতে আমার বড্ড বেশী ভয় করে! আমার ঘাম হচ্ছে, একটু বাতাস করে আমায় ঘুম পাড়িয়ে দাও!

আমার কোলের উপর মাথাটি রেখে তিনি শুয়ে পড়লেন। আমি বাতাস করতে করতে ভাবতে লাগলুম, ভয় করেন কেন? তবে কি কোন কথা সত্যিই তিনি আমার কাছে বরাবরই লুকিয়ে যাচ্ছেন? ওঁর কি কোন শক্ত অসুখ করেছে? কি—কি এমন অসুখ, যা তিনি আমার কাছেও প্রকাশ কর্ত্তে ভরসা করেন না! এমন কী অসুখ?... ...

মনে মনে কত এলোমেলো কথার আলোচনা করলুম, কিন্তু কোন কিনারা খুঁজে পেলুম না।

তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, আমি তখন আস্তে আস্তে তাঁর মাথাটি তুলে বালিসে শুইয়ে দিয়ে গুম্ হ'য়ে ব'সে ভাবতে লাগলুম। ভাবনার শেষ পেলুম না, একটা হ'তে কি করে যে আর-একটা ভাবনা ঘাড়ে এসে পড়ে সব গণ্ডগোল ক'রে দেয়, কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারি না। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে মনে-মনে একটা কথা ঠিক করলুম যে, কলকাতায় প্রভাতবাবুর কাছে একখানা চিঠি লিখব, একবার তাঁকে এখানে আসতে লিখব।

তখন লজ্জা-সরমের কোন কথাই আমার মনে এল না। কে যেন আমার ভেতর থেকে ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে বলতে লাগল, কি একটা অজানা বিপদের গাঢ় মেঘ আমার চারিপাশে ধীরে-ধীরে ঘনিয়ে উঠছে! প্রভাতবাবু আমার স্বামীর শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ডাক্তার, তাই প্রথম তাঁর কথাই আমার মনে হ'য়ে গেল।

তখনই কালী কলম কাগজ নিয়ে প্রভাতবাবুর নামে একখানা চিঠি লিখতে ব'সে গেলুম।

ঢং ঢং ক'রে দেওয়ালের গায়ে ঘড়িতে রাত্রি বারোটা বাজল। ভিতরে বাইরে গভীর নিস্তব্ধতা; কিন্তু আমার চোখে নিদ্রার লেশ মাত্র ছিল না।

শচীনাথের কথা

সার। আকাশ জুড়ে কেমন মেঘের পরে মেঘ এসে জমচে ! মেঘের মধ্যে কি-একটা প্রচ্ছন্ন মাদকতা আছে, যা' মানুষের মনকে আপনা-আপনি নাচিয়ে তোলে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, এই বাদল-মেঘ, এই গম্ভীর কালো আকাশ, এদের দেখলেই কে যেন আমার হাত ধরে' ঐ খোলা আকাশের তলায় ঐ মাঠের মাঝে টেনে নিয়ে যেতো ! কালবৈশাখীর ঝড়ে সেই ধুলো-বালি মাথায় ক'রে মরিয়া হ'য়ে আম কুড়োতে বেরুনো, মাথার ওপর বিদ্যুতের চকমকানি আর বজ্রের হুঙ্কার শুনে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ানো, সে আনন্দ—সমস্ত জীবনে সে দুর্দ্দম আনন্দের আবেগ বোধ হয় আর কখনো অনুভব করিনি !

আজ মাথার ওপর মেঘের তেমনি নাচন, প্রাণ যেন সকল বাঁধন—সকল অবসাদের শিকল কেটে সেই নাচনে যোগ দিতে চাচ্ছে, কিন্তু

কী আকুল হতাশায় সে আপনার পায়ে আপনি আছড়ে পড়ছে! থেকে-থেকে তাই বুকের ভেতর বিদ্রোহীর স্বরে কে চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে—জীবনের গণা দিনগুলো যদি ফুরিয়েই এসে থাকে, তবে সে যত শীঘ্র যায়, ততই তো ভালো! আর এ জীবনের ব্যর্থ অভিনয় কেন?

দিনরাত এই আকুল—অসহ্য চিন্তা আমার হৃদয়খানা—বুঝিবা, আমার বুকের হাড়কখানাও কেমন ক'রে পিষে চলে' যাচ্ছে, তা আমি মুখ ফুটে বল্‌তে পার্‌ছি না—কিন্তু অনুভব করছি; অনুভব করছি, আমার মস্তিষ্কের প্রতি শিরায় শিরায়—শরীরের প্রতি রক্তবিন্দুটীতে!

উঃ কি অসহ্য ভুল—কি মারাত্মক দুঃসাহস আমি করেছি! আজ তারই ফলভোগ আমায় করতে হচ্ছে! জেনে-শুনে তীব্র বিষপান ক'রে ভেবেছিলুম নীলকণ্ঠ হব; আজ সেই বিষের তীব্র জ্বালা আমার দেহের প্রত্যেক পরমাণুটী পর্য্যন্ত দগ্ধ করছে!... ...

আজ যদি আমি একা হ'তুম, উমা বলে কোন মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় না হোত, তার হৃদয়ের সমস্ত সুধা নিঃশেষ ক'রে যদি সে আমায় পান না করাত, তাহ'লে সে অবস্থা আর এ অবস্থায় কি প্রভেদই না থেকে যেত!

কিন্তু—কি আশ্চর্য্য এই অবিশ্বাসী মনের গতি! যখনি ঐ কথা ভাবি, তখনই কোন্ প্রচ্ছন্ন শত্রু ভিতর থেকে প্রতিবাদের সুরে ব'লে ওঠে—কিন্তু আজ তাহ'লে এই নিঃসহায় অবস্থায় কে তোমায় দেখ্‌তো? এ কথার উত্তর দিতে আমার সমস্ত বুদ্ধি নিঃশেষ হ'য়ে আসে! একবার মনে হয়, তাতো সত্যি! মা ছিলেন, তাঁকেও

হারালুম, এখন ঐ উমা আছে ব'লেই তো কোন কষ্ট—কোন অভাব জানতে দিচ্ছে না !

কিন্তু নিজের মনকে আমি কেমন ক'রে বোঝাবো যে, অসহায় ভাবে এই নির্জ্জন বাড়ীতে—কিম্বা পথে-ঘাটে যেখানে হোক্ প'ড়ে যদি আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে হোত, তাহ'লে তো এত কথা আমায় ভাব্‌তে হোত না ! তখন তো দিনরাত স্বপ্নে জেগে এই অনুভূতিটা আমায় দংশন কর্‌ত না যে, ঐ উমা—জীবনের উজ্জ্বল প্রভাতে যে প্রফুল্ল পদ্মটি সবেমাত্র ফোটার আনন্দে যৌবন-তরঙ্গে নৃত্য করছিল, তাকে আমি নিজে হাতে ছিঁড়ে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায় ফেলে দগ্ধ করেছি ! তখন তো এই নিদারুণ সংজ্ঞাটুকু নিয়ে আমায় শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে হোত না যে, আমার পিছনে বিরাট সাহারার মাঝে একান্ত নিঃসহায় ভাবে এমন একজনকে ফেলে চল্লুম, যাকে তার এই সুদীর্ঘ জীবন এই মরুভূমির উত্তপ্ত বালুরাশির মাঝে পড়েই ছটফট্ কর্‌তে হবে, আশ্রয় তার এতটুকু মিল্‌বে না !...যদিও ভগবানের আশীর্ব্বাদে কিছুদিন বাঁচ্‌তুম, এই চিন্তাই আমার সে আয়ুকে সংক্ষিপ্ত ক'রে আন্‌ছে !... ...

জ্বরটা ছেড়ে গিয়েছে, সকালে বেশ আছি, তবু ঐ চিন্তা—ঐ চিন্তা আমায় যেন শিশুর চেয়েও দুর্ব্বল ক'রে দিচ্ছে !... ...

ঐ উমা আস্‌ছে ! মুখে ওর হাসি নেই কেন ? সোহাগের—আদরের সেই চিরপ্রফুল্ল হাসি উমার আমার কে নিবিয়ে দিলে ? ও কি কিছু জেনেছে ?

কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে বল্লে—গা দিব্যি ঠাণ্ডা ! তবু

এইখানে বসে বসে যা-খুসী-তাই ভাবছ তো? আমায় তুমি কিচ্ছু বল্‌বে না, তা জানি। কিন্তু যাকে না ব'লে থাক্‌তে পার্‌বে না, এমন লোককে আমি আস্‌তে লিখে দিয়েছি!

বিস্মিত হলুম।

—কার-কথা বল্‌ছ উমা?

সে বল্লে, প্রভাতবাবু। তাঁকে আমি এখানে আস্‌বার জন্যে অনেক ক'রে লিখে দিয়েছি!

সহজে আমার মুখে আর কোন কথা এল না। সে বল্লে—কথা ক'চ্ছ না যে?

বল্‌লুম—কেন আবার তাকে বিরক্ত করতে গেলে উমা?

সে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বল্লে—তা নইলে তোমার এই জ্বর, আর দিনরাত এই ভাবনা, একা আমি কোন্‌দিক দিয়ে কি ক'র্‌ব?

আমি তার চিবুকটী ধরে আদর ক'রে বললুম—পাগল হ'য়েছ! আমার এই সামান্য জ্বরে তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

সে অনুযোগের কণ্ঠে বল্লে—ব্যস্ত আমি হচ্ছি, না, তুমিই আমাকে ব্যস্ত কর্‌চ?

তার চোখ দুটী জলে ভ'রে এল'। আমি আঁচলে তা মুছিয়ে দিয়ে, গালে মুখে তপ্ত চুম্বনের স্পর্শ দিয়ে বল্‌লুম—ওগো না, না গো আমার রাণি, আর আমি কিচ্ছু কর্‌বো না।

তার মুখের সে মলিনতা কেটে গেল। গভীর মমতায় আমার মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ছোট্ট পোষা পাখীটির মত আপনার মনে কত কথাই ব'লে যেতে লাগ্‌ল, শুন্‌তে শুন্‌তে আমি

তন্ময় হ'য়ে গেলাম। সকল দুশ্চিন্তা আমার কোথায় উড়ে চ'লে গেল। মুগ্ধ অন্তরাত্মা ভিতর থেকে যেন বারম্বার চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—ভগবান, এ যে এক বিপুল রাজ্যসুখ! এই সৃষ্টিই তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে ধন্য ক'রেছে!

দুদিন পরে প্রভাত এসে হাজির হ'ল। মুখখানা তার আষাঢ়ের মেঘের মত কালিবর্ণ। আমি তাকে অভ্যর্থনা করলুম। সে চুপ ক'রে ব'সে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে শুধু মুখ ফুটে বল্লে, তারপর? কেমন আছ?

আমি জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বল্‌লুম, সে তো উমার চিঠিতেই শুনেছ! জ্বরটা হঠাৎ ফুটেছে! আজ এই চার বৎসর পরে!... উমা কিছু লেখেনি?

—তা লিখেছেন বৈ কি! তুমি ওঁর কাছে কিছু প্রকাশ করেছ?

আমি বল্‌লুম, পাগল! কি করে বল্‌বো ভাই!...

সে আর কোন কথা না বলে চুপ করে রইল।

এমন সময় উমা ঘরে এসে ঢুক্‌ল'। প্রভাতকে দেখেই তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি হেসে বল্‌লুম, বেশ লোক ত'! নিজে চিঠি লিখে বেচারাকে সেই কল্‌কাতা থেকে ছুট করিয়ে আনালে, আর এখন নিজেই ছুটে পালাচ্ছো!

সে দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্ত্তকাল নতমুখে থেকে আস্তে-আস্তে বল্লে, কষ্ট দিয়েচি ওঁর বন্ধুর জন্যেই, আমার জন্যে নয়!

প্রভাত যেন এই রহস্যের সুযোগটুকু কোনমতেই ব্যর্থ হ'তে দিতে

পার্‌লে না। সে মৃদু হেসে বল্লে, ওটা কিন্তু ঠিক সত্যি কথা হ'ল না বৌদি! চিঠিতে আপনার নিজের ভাব্‌নার কথাটাই যে বেশী ক'রে লেখা!

মুখখানা ফিরিয়ে উমা যেন নিজের অপ্রতিভ ভাবটা সাম্‌লে নিলে। তারপর বল্লে, কিন্তু এটুকু কষ্ট না দিয়ে আমার উপায় ছিল না যে!

কথার সুরে এতখানি কুণ্ঠার আভাস পেয়ে প্রভাত ব'লে উঠ্‌ল, মাপ ক'রো বৌদি! নিতান্ত ঠাট্টা করেই কথাটা বলেছি। তোমরাও যদি এই ছোট-খাট ব্যাপারে আমায় কষ্ট দেওয়া হচ্ছে মনে কর, তাহ'লে তো আমার লজ্জা রাখ্‌বার জায়গা থাকে না।

যতটুকু দেখা গেল, তাতেই বুঝ্‌লুম, উমার মুখখানি রাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে। প্রভাতের কথা শেষ হয়েছে দেখে আমি বল্‌লুম, বা, এই তো প্রভাত, দিব্যি তোমার বৌদির সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে গেল! উমা, তাহ'লে এইবার একটু ঠাকুরপোর মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা ক'রে ফেল।

প্রভাত কি বল্‌তে যাচ্ছিল, তার আগেই উমা চলে গেল। প্রভাত রাগ করে বল্লে, তোমার এই কর্ত্তৃত্বের বহর দেখে আমার বড় রাগ ধরে যায়! মিষ্টিমুখ কি পালিয়ে যাচ্ছিল?

হেসে বল্‌লুম, তা জানি। উমার ঐ আন্‌কোরা কথাগুলো খুব মিষ্টি লাগ্‌ছিল। তা ভয় কি, একবার যখন বাঁধ ভেঙেচে, তখন ওদিক দিয়ে মিষ্টিমুখ আরো অনেক হ'তে পার্‌বে!

প্রভাত হেসে বল্লে, আচ্ছা, খুব রসিকতা শিখেছ, থামো। এখন কাজের কথা কও দেখি!

আমি বল্‌লুম, কি, আমার শরীরের কথা? মাপ করো ভাই!

খাস্ Her Majestyর নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছ, এবার তো আর শীগ্গীর ফেরা হচ্ছে না! অসুখের কথা কইবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। এখন ছুটো অন্য কথা কও দেখি! তোমাদের সব বন্ধু বান্ধবদের কথা, কে কি করছ, কেমন আছ, নতুন কা'র কি খবর আছে তাই বল। তোমার আর কিছু ছেলেপুলে হ'ল?

প্রভাত হেসে বল্লে, না। আর আমাদের দরকারও নেই। ঐ এক ছেলে আর এক মেয়ে দুজনে দুটীকে ভাগ করে নিয়ে দিব্যি শান্তিতে আছি।

তারপর একে-একে অনেক কথা হ'ল। নিজেকে বাদ দিয়ে মনটাকে অনেক দিনের পর আর পাঁচজনের কথায় ছেড়ে দিয়ে যেন অনেকটা বায়ু পরিবর্ত্তনের কাজ হ'য়ে গেল।

রোজ যে সময় জ্বর আস্তো, আজ সে সময়টা নিজেকে বেশ সুস্থ মনে করতে লাগলুম। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে চোখ ছুটো জ্বালা করে আস্তেই প্রাণটা যেন দ্বিগুণ দমে গেল। প্রভাত জ্বরের উত্তাপ দেখলে, ১০০। উমা কাছে ছিল না, বুকটা আবার ভাল করে পরীক্ষা করলে। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ কিছুই বল্লে না।

উমা ভিতরে খাবারের আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। ঘণ্টাখানেক পরে সে ঘরে ঢুকতে প্রভাত উঠে আস্তে আস্তে অন্য ঘরে চলে গেল। উমা বুকে হাত দিয়ে শিউরে উঠল।

—মা গো! আজ যে গা একেবারে আগুন হ'য়ে উঠেছে!

আমি বল্লুম, হ্যাঁ, আজ যেন বড্ড বেশী কাবু করে দিয়েছে! আজ বোধ হয় একাদশী!...তোমার কাজকর্ম্ম সব সারা হ'ল?

—হ্যাঁ। কেন?

—তাহ'লে প্রভাতকে অম্‌নি খেতে দাও, আর তুমিও খেয়ে নাও না!

—যাই। একবারটি তোমার কাছে বসি। মাথায় হাত বুলিয়ে দোব?

—দাও।

তার হাতের মৃদু স্পর্শে কি যেন এক ঘুমের ওষুধ লুকানো ছিল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সেই ঘুম আধেক রাতে ভেঙ্গে গেল। আমার সারা দেহ, এমন কি মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত তখন ঘামে ভিজে উঠেছে। বিছানার এক প্রান্তে উমা অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছিল, আমি তার শাড়ীর আঁচলখানি টেনে নিয়ে বুকের পিঠের ঘাম মুছে ফেল্‌লুম। নিজেই বুঝলুম, জ্বরের বেগ তখন অনেকটা ক'মে এসেছে।

খোলা জানালা দিয়ে ফুর্‌ফুরে বাতাসটুকু ভারী মিষ্টি লাগল। মেঘের আড়াল থেকে ফিকে চাঁদের আলো বিছানার উপর প'ড়ে উমার ঘুমন্ত মুখখানিকে বেশ একটু উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিল। কপালের উপরকার চুলগুলি তার উড়ে এসে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার দেহ-মন কি-এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় ভ'রে উঠল'। উমার খুব কাছটীতে স'রে এসে তার বুকের উপর মুখখানি চেপে শুয়ে রইলুম।...অমৃত কি, তা জানি না, কিন্তু তখন আমার দুর্ব্বল শরীরের প্রতি শিরায়-শিরায় যে অপূর্ব্ব শান্তির প্রবাহ ব'য়ে যেতে লাগ্‌ল, স্বর্গের অমৃতের আস্বাদন বোধ করি তার চেয়ে বেশী মধুর নয়।...অনেকক্ষণ শুয়ে রইলুম, ঘুম আর সহজে আস্‌তে

চাইলে না। উমাকে জাগিয়ে তোলবার লোভ হ'তে লাগল। মাথা তুলে সেই জ্যোৎস্নায়-ধোওয়া ঘুমন্ত চাঁদখানির পানে নির্ণিমেষে তাকিয়ে রইলুম। মনে হল, আকাশের চাঁদের কাছে আমার ঘরের এই চাঁদ কিসে ছোট! হৃদয় এক অপূর্ব্ব গৌরবে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল! আমার মত এত সৌভাগ্য কার? এমন স্ত্রী, এত রূপ, এত গুণ—

...প্রাণের ভিতর নেশার আমেজ গাঢ় হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। কম্পিত অধর দুটী দিয়ে তার সেই গোলাপী অধর দুখানির মধ্যে কামনার তপ্ত সুরা ঢেলে দিলুম। সে ধড়্‌মড়্‌ করে জেগে উঠ্‌ল। যেন সে চুম্বনের উত্তাপ তার কাছে বড় বেশী অসহ্য হ'য়েছিল। আমার মুখের পানে তাকিয়ে যেন ভৎসর্নার কণ্ঠে বল্‌লে,—কি, উঠে বস্‌লে কেন?

আমি তার কোলের উপর মাথাটি রেখে বললুম—সেই কোন্‌ সন্ধ্যে থেকে ঘুমোচ্ছি, আর সহজে ঘুম আস্‌চে না।

সে বল্লে—তা হোক্‌, ঘুমোও। না হয়, আমার কোলেই শুয়ে থাক চুপটি ক'রে।

আমার প্রাণ কিন্তু তা চাইলে না। বল্‌লুম—না, তুমি শোও, দিব্যি চাঁদের আলোটী তোমার মুখে এসে পড়েছিল; এমনি ভাল লাগছিল, কি বল্‌বো!

হঠাৎ তার রুক্ষ স্বরে চম্‌কে উঠলুম। যা-তা আমার মাথামুণ্ডু বকতে হবে না; যা বল্‌চি, ঘুমোও দেখি চুপটি করে! কাল থেকে আমি মেঝের ওপর আলাদা বিছানা করে শোব।

মাথার ওপর যেন বজ্রাঘাত হল। আকুলকণ্ঠে বললুম—কেন? কেন উমা?

উমার কণ্ঠস্বর আরো তীব্র হয়ে উঠ্‌ল। কেন আবার কি? সেদিন তুমি ঐ কথাই বলেছিলে, আমি না-বুঝে অভিমান করেছিলুম; কিন্তু আজ সব জেনে-শুনে তো আর আমি সর্ব্বনাশের কারণ হ'তে পারবো না!

কথাটা ব'লেই তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরিয়ে নিলে। মনে হ'ল, শেষের দিকে কণ্ঠস্বর তার চোখের জলে রুদ্ধ হয়ে এল। এর পর কি-যে আমি বল্‌বো তা কিছুই ঠিক কর্‌তে পারলুম না। খানিক চুপ ক'রে থেকে বললুম—কিন্তু তা কেমন করে হবে উমা? মেঝের ওপর তুমি শোবে, আর আমি—

বাধা দিয়ে উমা ব'লে উঠল—তাহ'লে আমি পাশের ঘরে শোব।

এবার তার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা যেন আমায় সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে গেল। আর কোন কথা না ব'লে আমি ধীরে ধীরে বিছানার উপর শুয়ে পড়লুম।

বাকী রাত্রিটা আর দুজনের মধ্যে একটা কথাও হোল না। আমার মনে কেবল ঐ কথাটাই কঠোর স্বরে বাজতে লাগলো—'সব জেনে শুনে তো আমি সর্ব্বনাশের কারণ হ'তে পারবো না!' উমা কি তাহলে সমস্ত কথাই জান্‌তে পেরেছে? কেমন ক'রে জান্‌লে?...

এ সমস্যার মীমাংসা সকালে উঠেই হ'য়ে গেল। প্রভাত বল্‌লে, কাল ভাই বৌদিদি আমায় হার মানিয়েছেন।

জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লুম, রাত্রে প্রভাতকে খেতে দিয়ে উমা হঠাৎ একান্ত জিদ ধ'রে বসে—আপনি ওঁর বন্ধু ডাক্তার! ওঁর শরীরে কি অসুখ হয়েছে, তা আপনি জানেন, অথচ সে কথা আমার কাছে

লুকিয়ে রেখেচেন! কিন্তু আমি স্ত্রী, সে কথা জানা আমারও দরকার! আজ আর কোন কথা আপনি লুকোতে পাবেন না। বলুন, কি ওঁর অসুখ। ... ...

প্রভাত অপরাধীর মত আমায় বল্লে—আমায় তুমি দুষো না ভাই! তাঁর সে জিদ এত বেশী যে, আমি কিছুতেই তাঁকে বাজে কথায় ভোলাতে পারলুম না।...সব কথাই আমি বলে ফেলেচি!

স্তব্ধের মত ব'সে রইলুম। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রভাত বল্লে—আর ভেবে দেখচি, অন্যায়ও এতে বিশেষ কিছু করিনি! লুকোচুরি বেশী দিন চলে না, চল্‌বেও না বেশীদিন, বিশেষ ওঁর মত বুদ্ধিমতী মেয়ের কাছে!...ব'লে আরও খানিক চুপ্ ক'রে থেকে বল্লে—আমি একটা কথা মনে করচি, শুনবে?

—কি?

—দিন কতক চেঞ্জে যাওয়া এখন তোমার পক্ষে বিশেষ দরকার! এই প্রথম মুখে যদি কিছু বেশীদিনের জন্যে সমুদ্রের ধারে ঘুরে আস্‌তে পারো, তাহলে বিশেষ উপকার হবে। কিন্তু, আর বেশীদিনের পুরোণো হ'য়ে গেলে তখন্ তেমন কিছু সুবিধা হবে না। কি বল?

আমার তখন কোন-কিছুই ভেবে দেখ্‌বার শক্তি বা প্রবৃত্তি—ছিল না। বললুম—আমাকে আর কেন জিজ্ঞাসা কর ভাই! তুমি যা ভাল বুঝ্‌বে, তাই আমার ভাল!

প্রভাত অনুযোগের স্বরে বল্‌লে—ঐ তো তোমার দোষ! একে এই অসুখ, তার ওপর ঐ রকম nervous হ'তে গেলে আর ক'টা দিন

বাঁচ্‌বে বল দেখি!...কথা হচ্ছে এই যে বৌদি'র তো তোমার সঙ্গে যাওয়া হবে না!

ওর যাওয়া হবে না? তবে আমি কি ক'রে—

প্রভাত বল্লে—অমন পাগলের মত কথা বলো না শচী! এখন তোমাদের দু'জনের আলাদা থাকা যে কতটা দরকার, সেটা আমি না বল্লেও তোমার বোঝা উচিত! কিন্তু ভাব্‌চি, বৌদিকে বোঝাই কি ক'রে!

ঠিক সেই সময় হঠাৎ পায়ের শব্দে চম্‌কে উঠ্‌লুম। চেয়ে দেখি, উমা।

প্রভাত এবং আমি দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে চুপ্‌ ক'রে গেলুম। প্রভাত ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, উমা আমার কাছে এসে বল্‌লে—ঠাকুরপোকে দাঁড়াতে বল।

প্রভাত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। উমা খানিক নীরব থেকে যেন চেষ্টা ক'রে কথা জড় ক'রে বল্লে—আমাকে বোঝাবার জন্যে আপনাদের একটুও কষ্ট পেতে হবে না। কি কর্‌তে হবে আমায় ব'লে দিন, আমি সব বুঝবো।

এর পর প্রভাতের পক্ষে তার বক্তব্য সুরু করা যে কত শক্ত, তা আমি বুঝলুম। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর সে ব'লে ফেল্লে—আমি বল্‌ছিলুম, শচীর এখন কিছুদিন হাওয়া খেতে যাওয়া দরকার। তাই বল্‌ছিলুম—কিন্তু এই ইয়ে—বল্‌ছিলুম যে, আপনার ওর সঙ্গে না-যাওয়াটাই ভাল—

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন এক

কুৎসিৎ স্তব্ধতা জমাট বেঁধে উঠ্‌ল। আধ ঘোমটার নীচে থেকে উমার মুখ দেখা যাচ্ছিল না; এমন কি, তার দেহের কোনখানে এতটুকু স্পন্দন পর্য্যন্ত দেখা গেল না, যা থেকে প্রভাতের প্রস্তাবের কোন রকম সাড়া টের পাওয়া যায়। প্রায় এক মিনিট কাল এই কুৎসিৎ স্তব্ধতার মাঝখানে তিনজনে ব'সে থাকার পর উমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—বেশ! তাই ঠিক করুন! ব'লে সে আস্তে-আস্তে ঘর ছেড়ে চ'লে গেল।

আমার বুকের ভিতর থেকে একটা যেন আকুল হাহা শ্বাস বাইরে আস্‌তে চাইলে। প্রভাতের হাতদুখানা শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে ব'লে উঠ্‌লুম—প্রভাত! প্রভাত!

আমার কথা শেষ হোলো না। চাকরাণীটা হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এসে বল্লে—ও দাদাবাবু, শীগ্‌গীর আসুন! বৌদি কেমন কর্‌চে!

দুর্ব্বল শরীরখানা হিঁচ্‌ড়ে টেনে তুলে বাড়ীর ভেতর ছুটে গেলুম। দেখি, দাওয়ার ওপর উমা পড়ে আছে—নিস্পন্দ হ'য়ে! চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌তে ইচ্ছা হোল, কিন্তু পিছন থেকে প্রভাত এসে বল্লে, মূর্চ্ছা হ'য়েচে বুঝি? দাঁড়াও, দাঁড়াও, স্মেলিং শল্টের শিশিটা নিয়ে আসি! প্রভাত দৌড়ে শিশি আনতে গেল, আমি মাথায় হাত দিয়ে তার কাছটাতে বসে পড়লুম।

নিশীথের কথা

ঐ একটা কথার মীমাংসা আমি আজ পর্য্যন্ত কিছুতেই ক'রে উঠ্‌তে পারলুম না।

সংসারে নিত্যনিয়ত চোখের সামনে যে সব ঘটনা দেখ্‌চি, সে-সব দেখেও এরা কেমন ক'রে বলে, বিবাহটা ভারী সুখের জিনিষ, তা তো আমি কোনোমতেই ধারণায় আনতে পারিনে! স্ত্রীর ভালবাসা পাওয়া না-পাওয়া সে ত' পরের কথা, ভাবরাজ্যের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার আগে যদি সরল দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখি, তাহ'লেই যে হৃদয় আতঙ্কে শিউরে ওঠে!

বেশী দূরই বা যেতে হবে কেন; ঐ আমার দাদার বন্ধু শচীবাবুদের কথা!...উঃ! কি ভয়ঙ্কর! সেই সেবার যখন শচীদাদার মায়ের শ্রাদ্ধে তাঁদের বাড়ীতে গিয়েছিলুম, তখনই প্রাণটা তাঁদের জন্য এমনি আকুল হ'য়ে পড়েছিল, কি বল্‌বো! ঐ শচীদাদা

নিজের অসুখের কথা জেনে-শুনেও লোভ সামলাতে না-পেরে হুট্‌ ক'রে যে একটা পরের মেয়েকে ঘাড়ে ক'রে বস্‌লেন, আমি তো বলি, তারই ফলে আজ তিনি তাঁর মৃত্যুকে জোর ক'রে ঘরে টেনে এনেছেন !

আর, এই রকম শচীদাদা কি সংসারে একজন ? কত-শত লোক যে এই ভুল ক'রে পরে তার জন্যে অনুশোচনা করছে তার কি ইয়ত্তা আছে কিছু ?

তাই যখনি ঐ সব কথা ভাবি, তখনই মনে হয়, চমৎকার আছি আমি ! চিন্তা নেই, উদ্বেগ নেই, আশঙ্কা নেই ! মৃত্যু যদি কোনদিন এসে পড়ে, তাকে স্বাগত অতিথির মত অভ্যর্থনা দিতেও কিছু কুণ্ঠিত হব না।...

লোকে বলে, স্ত্রী জীবনসঙ্গিনী, সংসারে বেঁচে থাক্‌তে হ'লে অমনি একটি সঙ্গীর বেজায় দরকার ! কিন্তু আমার সঙ্গীর তো অভাব নেই ! এই রঙ, এই তুলি, এরা সব নির্জীব জড়পদার্থ বটে, কিন্তু এরাই যে তাদের প্রাণের শোণিত ঢেলে আমার জন্যে কত বিচিত্র মধুর সজীব সঙ্গীর সৃষ্টি ক'রে দেয়, তার সন্ধান একা আমিই রাখি, আর কেউ রাখে না ! নিভৃতে—নির্জ্জনে তারা আমার সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে কত কথা কয়, কত হাসে, ইঙ্গিতে কত ভাবের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দেয়। প্রাণ যার একবার এই বিপুল রসের সন্ধান পেয়েছে, সে কি সংসারের এই মিথ্যা হাসি-কান্নার ভেতর ডুব দিয়ে জর্জ্জরিত হ'তে চায় ?...অন্ততঃ আমি তো চাই না।

কিন্তু এসব কথা শোনে কে ! বিয়ের জন্যে বৌদিদির পীড়াপীড়িতে অস্থির হ'য়ে যদি কোনো দিন সত্যি কথাটা বল্‌তে যাই, তো বৌদিদি

অমনি তাড়াতাড়ি থামা দিয়ে হো-হো ক'রে হেসে ওঠেন, যেন আমার যুক্তিটা যুক্তিই নয়! বলিহারী ভগবানের এই নারীসৃষ্টি! নিজে যতটুকু জানে বোঝে, তার মধ্যেই সে সম্পূর্ণ! তার বেশী কিছু ভাবতেও চায় না, বুঝ্‌তেও চায় না, কেউ সে চেষ্টা কর্‌লে এমনি বিজ্ঞের মত হেসে ওঠে, যেন সে লোকটা নেহাৎ একটা কৃপার পাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়! তাই ত ঐ জাতিটাকে আমি বেশ একটু ভয় ক'রেই চল্‌তে চাই! ... ...

এতদিন একা বৌদিদিই ছিলেন, সম্প্রতি আবার বাড়ীতে আর-একজনের শুভাগমন হ'য়েছে, তিনি শচীদাদার বউ!

শচীদাদা গেছেন পুরীতে চেঞ্জে, সঙ্গে তাঁর বামুন চাকর-চাকরাণী, আর দূর সম্পর্কের একজন ভাইও গেছে। শুনলুম দাদাই নাকি অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওঁদের দুজনকে পৃথক্ রাখ্‌বার জন্য শচীদাদার বউকে এখানে নিয়ে এসেচেন। কেন না, তাঁদের নিজের ত আর কেউ নেই, যেখানে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়! নিজের লোকের মধ্যে তাঁর কাকা আছেন, তা তিনি নাকি সেখানে যেতে একদম রাজী হন্ নি।

এখানে এসে অবধি শচীদাদার বউ আমাদেরই বাড়ীর একজন হ'য়ে পড়েচেন। পাছে পরের বাড়ী বলে তাঁর মনে সামান্য একটু-খানি কষ্ট বা কুণ্ঠা হয়, তার জন্যে মা, বৌদিদি সর্ব্বদা তাঁকে কাছে কাছে রেখেচেন। মা সেদিন বল্‌ছিলেন—এ তোমার নিজের ঘর বলেই মনে ক'রো মা! তোমার নিজের দেওর নেই, প্রভাত নিশীথ তোমার নিজের দেওর, ওদের অমন করে লজ্জা করে দূরে-দূরে থেকো

না। আমি তোমার মা, মায়ের কাছে মেয়ে যেমন ক'রে সব কথা বলে, তোমার যখন যা অসুবিধে. হবে, আমায় ব'লো, এতটুকু কিন্তু করো না।

শচীদাদার বউ ঘোমটা দিয়ে বসেছিলেন, মনে হোল, যেন ঘোমটার ভেতর তিনি কাঁদ্‌ছেন! যতই কেন হোক্ না, নিজের এই দারুণ দুর্দ্দশায় পরের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে মানুষের মন কি সহজে বুঝ্‌তে চায়?...কিন্তু করবেনই বা কি? উপায় তো কিছু নেই!

জোর ক'রে এই অবসাদের ভাবটাকে চাপা দিয়ে পরিহাসের তরল স্বরে বললুম—কিন্তু আমারই যে মুস্কিল হ'ল মা! আমার তো এই সবেধন-নীলমণি বৌদিদি; অথচ, ওঁকে যে আমি কি বলে' ডাক্‌বো তা একেবারেই ভেবে পাচ্ছি না!

মা, বৌদিদি হেসে উঠ্‌লেন। আমি বল্‌লুম্—বাঃ, এর মধ্যে আর হাসির কথাটা কি হোল? আচ্ছা, হ্যাঁ, একটি কথা মনে পড়েচে ...পেয়েচি।

বৌদিদি বল্‌লে—কি?

আমি বললুম—তুমি তো আমার বৌদিদির আসন কায়েমী ক'রে ফেলেছ, তার তো আর নড়চড় হবে না, এঁকে আমি বৌ'ঠান বলে ডাক্‌বো, কেমন?

মা বল্‌লেন—তা বেশ, বেশ! তোর বাছা সব তাতে রঙ্গ!

আমি বললুম—তা, বৌদিদি কি বৌ'ঠানের সঙ্গে যদি হাসি তামাসা না করব, তাহ'লে কার সঙ্গে করি বল ত? কথাতেই আছে—

বৌদিদি বলে উঠল—কি, চুপ করলে যে?

আমি ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলুম—মা রয়েছেন।

কিন্তু বৌদিদি বেজায় দুষ্টু! বল্লে—মা, তুমি একটু সরে' যাও তো গা।

আমি বাধা দিয়ে বললুম—না না, সরে যেতে হবে না! উঃ, তুমি বৌদি এমনি নাছোড়বান্দা!...বলছিলুম কি জানো, কথাতেই বলে শ্বশুরবাড়ীতে শালী, আর নিজের বাড়ীতে বৌদিদি, এ যার না আছে, সে বড়ই দুর্ভাগা!

মা হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে গেলেন। বৌদিদি সুযোগ পেয়ে বল্লেন—এটা কিন্তু ভাই তোমার দাদাকে ঠেসিয়ে বলা হ'ল! ওঁর না আছে শালী না আছে বৌদি!

আমি গম্ভীরভাবে বললুম—সেইজন্যেই ত দাদা নীরস ডাক্তারী শাস্ত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন, আর আমি ছবি আঁকছি!

বৌদিদি হেসে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, শচীদাদার বউ ঘোমটার কাপড় মুখে চেপে হাসি রোধ করবার চেষ্টা করচেন। বৌদিদি সেটুকু লক্ষ্য করে বল্লেন—বাঃ তুমি বুঝি অমনি ক'রে পুতুলটির মত বসে থাকবে? তা হবে না! বলে হঠাৎ তাঁর মুখের ঘোমটাটুকু টেনে মাথার ওপর তুলে দিলেন। তিনিও আর সেটা নামিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন না।

কিন্তু এ ব্যাপারে আমি নিজেই কেমন লজ্জায় পড়ে গেলুম, এবং তার ফলে সেই হাল্কা রহস্যালাপ এমন ভাবে আটক পড়ে গেল যে, আর কিছুতেই অগ্রসর হ'তে চাইলে না।

শুনেছিলুম, শচীদাদার বউ রূপসী ; কিন্তু এত রূপ তা জান্‌তুম না ! কি-কি হ'লে রূপ নিখুঁত হয়, সে সব আলোচনা আমি কোন কালেই করিনি, করতে চাইও না কোনদিন। দোষ-ত্রুটি খুঁজে বার করতে গেলে অমন যে ভুবন-ভোলানো আকাশের চাঁদ তারও কলঙ্ক চোখে পড়ে, তা তো মানুষের রূপ ! কিন্তু চাঁদেরও যেমন সুখ্যাতি করি, তার ঐ জ্যোৎস্নার জন্য, তেমনি রূপের মধ্যে একটা স্নিগ্ধতা, একটা মাধুর্য্য, অথবা একটা তেজস্বিতা বা অমনি একটা কিছু না থাক্‌লে আমি সে রূপকে রূপই বলি না। এমনি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভাব আমি বৌঠানের মুখে-চোখে দেখেছিলুম। তবে কি-জানি কেন সে ভাব দেখলে প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে না, কি যেন এক দুর্জ্জয় অবসাদে—কারুণ্যে সমস্ত অন্তর ভরপুর হ'য়ে উঠে। সে যেন সত্য সত্যই এক প্রাণময়ী বিষাদ-প্রতিমা ! আমি অনেকগুলি বিষাদের ছবি এঁকেছি, কিন্তু এমন প্রচ্ছন্ন—অথচ এমন স্পষ্ট বেদনার করুণ ছায়াটুকু তুলির রেখায় ফুটিয়ে তুল্‌তে বোধ হয় আমি একেবারেই অক্ষম !

দিনের পর দিন এঁদের সকল কথা আমি শুন্‌তে পেলুম। কতক বৌদিদির মুখে, কতক তাঁর নিজের মুখে। তাঁর মধুর স্বভাবের গুণে তিনি সত্য সত্যই আমাদের নিজের বৌঠানের আসনটী দখল ক'রে বসেছেন, সুতরাং প্রথমকার সে লজ্জার আগল খসে পড়তে বড় বেশী দেরী হয় নি।

অনেকদিন আমি নির্জ্জনে নিজের মনে এই সমস্যাটা তোলাপাড়া করতুম, শচীবাবু না হয় রূপের মোহে পড়ে—আর এখন দেখে শুনে

বুঝেছি, তাঁকে খুব বেশী দোষ দেওয়াও যায় না, রক্তে মাংসে গড়া মানুষ ত তিনি! তা তিনিই না হয় বিবাহ কর্ত্তে রাজী হ'লেন, কিন্তু মেয়েদের অভিভাবক কি ব'লে এমন পাত্রের হাতে কন্যা সমর্পণ কর্‌লে? শচীদাদা কি তবে ও-সব কোন কথা ঘুণাক্ষরে না জানতে দিয়েই নিজের এবং সেই সঙ্গে আর-একটী তরুণ জীবনের সর্ব্বনাশ করেছেন? তা যদি করে থাকেন, তাহ'লে তাঁর দোষ একেবারেই অমার্জ্জনীয়!

কিন্তু পরে যা শুন্‌লুম, তাতে বুঝলুম, শচীদাদার দোয তত নয়, যত দোষ মেয়ের অভিভাবকদের। উঃ, ভাব্‌তেও হৃৎকম্প হয়! অমন স্বর্ণ প্রতিমা, মা-বাপ তার কেউ নেই বলে সেই পিশাচ কাকাটা পয়সার মায়ায় এতবড় কাণ্ডটা অনায়াসে করে বসল'! বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের মূল্য কি এক কাণা কড়িও নয়, যে তাদের বিলিয়ে দেবার আগে অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে দেখবার এতটুকুর দরকার নেই! এই কি আমাদের ঘরের মা-বোনদের প্রতি শ্রদ্ধার মাপকাঠি?

এমনি সব নানান্ রকমের সমস্যার কথা আমার আজকাল মনের ভেতর ফেনিয়ে ওঠে, বিশেষ করে, যখন শচীদাদার বউ—আমার বৌ'ঠানের কথা মনে পড়ে। সময়ে সময়ে যখন তিনি আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কন, তখন এই সব এলোমেলো হাজার কথা বুক পর্য্যন্ত ঠেলে উঠ্‌তে চায়, কিন্তু জোর ক'রে সে সমস্ত চাপা দিয়ে হাসি তামাসার কথা ব'লে যাই। তার জন্যে এরই মধ্যে মস্ত বড় একটা সুনাম বৌঠানের কাছে অর্জ্জন করা গেছে; তিনি বলেন, ঠাকুরপো মরা মানুষকেও হাসাতে পারে!

এর তাৎপর্য্য আমি বুঝে বলেছিলুম—সংসারে অল্পবিস্তর কাঁদতে তো সকলেই এসেছে বৌঠান, এই কান্নার মাঝখানে যতটুকু সময় হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে পারা যায়, ততটুকুই কি লাভ নয়?

তিনি বল্লেন—তাতো ঠিক! পরে একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বল্লেন; তোমাদের এখানে এসে তাই আমি তো তবু টিকে আছি, নইলে—

কথার শেষে তাঁর ব্যথার করুণ রেশটুকু হৃদয়ে এসে বাজল; কিন্তু উত্তর বা আশ্বাস দেবার ভাষা খুঁজে পেলুম না। খানিক চুপ ক'রে থেকে বললুম—হ্যাঁ, তোমার সে বই দুখানা পড়া হ'য়ে গেছে না কি? হ'য়ে গেলে ব'লো, আমি আবার দু'খানা এনে দোব।

—না। একখানার একটু বাকী আছে, আর একখানা কিরণদিদি পড়চে।

সহরের দু' তিনটা লাইব্রেরী থেকে আমার বই আস্‌তো তারই ভেতর থেকে আমি বৌঠানের পড়বার জন্য বাংলা উপন্যাস, গল্পের বই এনে দিতুম। মনে-মনে বল্‌তুম, বুকের উপর যার নিরন্তর এক পাষাণ-ভার চাপানো রয়েছে, এই সব পড়াশুনা নিয়ে থাক্‌লে অন্ততঃ তা থেকে রেহাই তো একটু পাবে! আর লক্ষ্য কর্‌তুম, আমার উদ্দেশ্যও নিতান্ত বিফল হয় নি! ঐ সব বই প'ড়ে প্রায়ই বৌদিদির সঙ্গে এবং কখনো-কখনো আমার সঙ্গেও আলোচনা করতে বস্‌তেন, বিপুল উৎসাহ নিয়ে!...

সেদিন এসে বল্‌লেন—না ঠাকুরপো, এরকম বই আর তুমি এনে দিও না আমায়। বইয়ের ভিতর দিয়েও এত দুঃখের কাহিনী শুনতে

গেলে আমার বাঁচা দায় হ'য়ে উঠ্‌বে! এরকম কান্নার বই তো আমার জীবন নিয়েও একটা মস্ত হ'তে পারে!

অসাবধান মুখ দিয়ে বেড়িয়ে গেল—আমার তাই লোভও হয় মাঝে-মাঝে!

—কি, এই নিয়ে একখানা বই লিখ্‌তে? সত্যি, লেখ না!...কিন্তু, শেষটা কি করবে? শেষ ত এখনো জানা যাচ্ছে না!

আমার সমস্ত মুখখানা কালী হ'য়ে উঠ্‌ল। কোন কথা আর মুখ দিয়ে বেরুতে চাইলে না।

বৌঠান যেন জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বল্লেন—কি, গুম্ হ'য়ে গেলে যে? তুমি বুঝি ভাব্‌চ, ঐ কথা ব'লে আমার মনে কষ্ট দিলে? একটুও না! আগুনের ঝাঁজ যে আমার বড্ড বেশী গা-সহা হ'য়ে গেছে ঠাকুরপো! ... ...

তবু আমি কোন কথা কইতে পারলুম না। তিনি তাঁর মুখের হাসি বজায় রেখে বল্লেন—আচ্ছা, কথার কথা ধর, গল্পে যদি আমার মত এমনি একটা ঘটনা লিখ্‌ত, তাহ'লে কি রকমে তার শেষ হোত? বউটা আত্মহত্যা করছে? না—

বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লুম—কি সব বাজে বক্‌ছ বল দেখি বৌঠান্?

কিন্তু সে বাধায় কোন কাজ হোল না। তিনি বল্লেন—হ'লেই বা বাজে! সত্যি, বল না, গল্পে হ'লে বউটা আত্মহত্যা করত, না? আমার এক-একবার মনে হয় কি না—

তার পরের কথাগুলা আর শোনা গেল না। তাঁর মুখের পানে

চেয়ে দেখলুম ক্ষণপূর্ব্বের সে হাসি বাদল আকাশের রৌদ্রের মত অকস্মাৎ কালো মেঘে লুপ্ত হ'য়ে গেছে!

হঠাৎ আমার কেমন ভয় হোল। শুষ্কমুখে বল্লুম—কখ্খনো আপনি ঐ সব মারাত্মক কথা মনেও আন্‌বেন না! তিনি অপ্রতিভের মত মাথাটী নীচু ক'রে বল্লেন—পাগল হ'য়েছ তুমি? সে মনের জোর আমার আছে কি?

তার মানে? আত্মহত্যা করাটা কি খুব মনের জোর ব'লেই মনে হয় তোমার? আশ্চর্য্য ধারণা তো? যে সংসারে সামান্য একটা কীট পতঙ্গের সৃষ্টিরও সার্থকতা আছে, সেখানে এত বড় একটা মানুষের প্রাণের দাম কি এতটুকু নেই?

বৌঠান যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাসকে জোর ক'রে চাপা দিয়ে বল্লেন—মেয়েমানুষের দাম কীট পতঙ্গের চেয়েও কম!

আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে বললুম—ঐ মনে করেই আজ আমাদের এই দুরবস্থা! যাদের নিয়ে এই সংসারের প্রধান ভিত্তি, এতবড় পৃথিবীটাকে যারা তাদের গোপন শক্তি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের দাম কীট পতঙ্গের চেয়ে কম হবে বৈকি!

বৌঠান ম্লান হাসি হেসে বল্লেন—যাক্, তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে চাইনে!

সেই সময় বৌদিদি ঘরে ঢুকে বল্লেন—কিসের তর্কাতর্কি?

বৌঠান বল্লেন—না, কিচ্ছু না।

আমি সুযোগ বুঝে বললুম—কেন, বলি না বৌদিদিকে এখুনি কি বলছিলে?

বৌঠান লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লেন—কি আবার বল্‌ছিলুম! বাঃ, বেশ লোক তুমি যাহোক্‌!

আমি বললুম—জানো বৌদিদি! বৌ'ঠান বলছিল যে,—

বৌঠান তাড়াতাড়ি বৌদিদির হাত দুটো ধ'রে তাঁকে টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লেন—না গো দিদি, ঠাকুরপোর ওসব বাজে কথা! বল্‌তে বল্‌তে সত্য সত্যই তিনি বৌদিদিকে টেনে নিয়ে চ'লে গেলেন।

আমি হেসে উঠ্‌লুম। পরক্ষণেই সে হাসিকে আঁধার ক'রে কত রাশি-রাশি চিন্তা আমার অন্তর-বাহির ছেয়ে ফেল্‌লে! সেই নির্জ্জনে ব'সে তাঁর এক-একটী কথা ধ'রে বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌লুম, তার নীচে কতখানি শোণিতপ্রবাহ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে!

কি ভয়ানক! সত্য সত্যই তাঁর এই অবস্থায় যদি কোনদিন আত্ম-হত্যারই খেয়াল চেপে বসে? অসম্ভব কি? এই ত নিত্য নিয়ত শোনা যাচ্ছে, কি এক-একটা তুচ্ছ ঘটনা—সামান্য মনোমালিন্যের সূত্র ধ'রে জলজ্যান্ত মেয়েগুলো কেরোসিনে পুড়ে'—বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করছে. এ জাতের কাছে সবই সম্ভব! সংসারের এরাই মায়াময়ী, আবার মায়াকে অতি সহজে বিনাশ করতেও এরাই। তা, যদি সে খেয়াল এঁকেও পেয়ে বসে,—কি সর্ব্বনাশই না হবে! ... ...

মাথার ভেতর কত রকমের বীভৎস কল্পনা জেগে উঠ্‌ল। একলা ঘরে বসে-বসে ঐ সব ভাবাও অসহ্য বোধ হ'তে লাগ্‌ল; তাই কামিজটা গায়ে ফেলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। ... ...

কিন্তু ঐ চিন্তা সেখানেও আমায় রেহাই দিলে না। কিছুদিন আগে শুনেছিলুম, আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে তার ১৪ বছরের বউ

ভোরবেলা উঠে ছাদে দাঁড়িয়ে কেরোসিনে কাপড় ভিজিয়ে আত্মহত্যা করেছে! কল্পনায় সেই রকমের একটা ছবি আমার মাথার ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল! যদি আজ রাত্রির শেষে আমাদের বাড়ীর ছাদে ঠিক অমনি একটা ব্যাপার ঘটে!—

আর বেশী তলিয়ে ভাবতে পারলুম না। নিকটেই একজন বন্ধুর বাড়ী ছিল, তাড়াতাড়ি তার সন্ধানে সেখানে ঢুকে পড়লুম।

বিমল বাড়ীতেই ছিল, তার বৈঠকখানায় নানা রকমের গল্প-গুজব গান-বাজনা করার পর যখন বাড়ী ফিরলুম, তখন রাত্রি আটটা বেজে গেছে। আহারাদি ক'রে নিজের ঘরটিতে এসে একখানা অসম্পূর্ণ ছবি নিয়ে ব'সে গেলুম।

ছবিখানাকে অসম্পূর্ণ ঠিক বলা চলে না; সবে আরম্ভ করা হ'য়েছিল মাত্র। মনে-মনে কল্পনা ছিল, ছবিটা হবে গভীর বিরহ ব্যথার। কি রকম ক'রে রঙ ফলালে এই বিরহের মাত্রাটা খুব বেশী মর্ম্মস্পর্শী হয়, ব'সে ব'সে তাই চিন্তা করতে লাগলুম। বিরহ ত অনেক রকমের হয়, অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থ ঘরে প্রবাসী স্বামীর জন্য পত্নীর বিরহ, সৌখীন ঘরের প্রেমিকের জন্য প্রেমিকার বিরহ, আবার চিরদিনের জন্য স্বামীহারা বিধবার চির-বিরহ! শেষেরটাই অবশ্য সবচেয়ে করুণ? খুব সুন্দরী, অথচ বৈধব্যের কঠোর বিধানে আভরণহীন দেহ, রুক্ষ কেশ, মোটা ধুতি, অযত্নের মধ্য দিয়েও অগ্নিশিখার মত রূপের তীব্র জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে! এমন একটি বিরহিনীর ছবি হয় তো কারুণ্যের চরম হয়! কিন্তু সে শক্তি আমার কৈ?... .. ...

বিছানায় শুয়ে পড়লুম। চোখ বুঁজে একটী লাবণ্যময়ী মূৰ্ত্তির কল্পনা করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের মনেই শিউরে উঠলুম।

কল্পনার এ মূৰ্ত্তি যে বড় পরিচিত! শচীদাদার বউ! নিজের প্রতি ঘৃণাও একটু হোল, কিন্তু তার চেয়েও বেশী কেমন একটা ভীতি আমায় অভিভূত ক'রে ফেল্‌লে! সুন্দরী বিধবার চিত্র কল্পনায় আন্‌তে গিয়ে হঠাৎ তাঁরই ছবি আমার হৃদয়ের পটে জেগে উঠ্‌ল কেন? এর কি কোন প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে? সত্যই কি তবে—

জোর ক'রে এই অমঙ্গল চিন্তাকে ঠেলে রাখ্‌বার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বিফল হ'লুম। মনের ভেতর থেকে কে যেন বল্‌লে, এ অমঙ্গলের ছবি কি তোমারি একার মনে আসছে? যার স্বামীর এই মারাত্মক—শিবের অসাধ্য অসুখ, সে নিজেও কি দিবারাত্রি এই বিভীষিকা দেখ্‌চে না? তবে তোমার এত আতঙ্ক কেন?

ভেবে দেখ্‌লুম, কথাটা মিথ্যা নয়। ভবিতব্যকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না! বৈধব্য যদি বৌ'ঠানের কপালে থাকে, ত সেটা অনেক পূৰ্ব্বেই লেখা হ'য়ে গেছে, আমার সে কথা ভাবা না-ভাবাতে কোন-কিছুই এসে যাবে না।

আল্‌গা পেয়ে মন ঐ কল্পিত ছবির আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। আচ্ছা, যদি বৌঠানের কপালে সেই সৰ্ব্বনাশই হয়, তাহ'লে উনি কি করবেন? এই বয়স—সবে ষোল কি সতের—এখন থেকে যতদিন বাঁচবেন,... ...উঃ, কি ভয়ানক!

মাথার ভিতর কি-যেন একটা বিপ্লব এসে গেল। এতগুলো

বৎসর স্বামীর কথা ধ্যান ক'রে ধীরে ধীরে মরণকে আহ্বান করা, এ কি সম্ভব ? ... ...

তখনি আবার মনে হ'ল, অসম্ভবই বা কিসে !. কত শত সহস্র নারী—যুবতী—বালিকাও তাই করুছে !... ... হ্যাঁ, তা করুছে বটে ! কিন্তু ক'জন—তাদের ভিতর ক'জন নিজের ইচ্ছায় এই কঠোর জহরব্রত অবলম্বন ক'রে আত্মাহুতি দিতে যায় ?

মিথ্যা কথা, শতের ভিতর পাঁচজনও না ! সমাজের কঠোর অনুশাসন, তারই জোরে এত বড় একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার সংসারে চ'লে আস্‌ছে ! এই নিয়ে আন্দোলনও ত হচ্ছে অনেকদিন ধ'রে ; কিন্তু এর প্রতিকারের জন্য কোমর বেঁধে নাম্‌তে পেরেছে ক'জন ? ক'জন এর জন্য হৃদয়ের শোণিত ঢাল্‌তে পেরেছে ?

সমাজ-সমস্যার এক বিশাল গোলোক-ধাঁধা আমার মাথার ভিতর জেঁকে বসল। একবার মনে হ'ল, যদি জীবনে কখনো বিবাহ করি, তা'হলে তার ভিতর দিয়ে এমনি একটা কিছু দৃষ্টান্ত দেখিয়ে যাব ! এই যে সহস্র সহস্র নিরীহ প্রাণী মুখ বুঁজে কঠোর কারাযন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের ভিতর অন্ততঃ একজনকে মুক্তি দেবার সামর্থ্যও ত আমার আছে !

ভাব্‌তে-ভাব্‌তে মস্তিষ্ক খুব বেশী উত্তপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম, কিছুতেই ঘুম হ'ল না। জানালা দিয়ে চমৎকার বাতাস আসছিল, তবু অসহ্য গরম বোধ হ'তে লাগল, মাথার কাছে পাখার সুইচ্‌ টিপে দিয়ে নিস্পন্দ অবস্থায় পড়ে রইলুম।

সামনের জানালা দিয়ে নক্ষত্রদীপ্ত কালো আকাশখানা দেখা যাচ্ছিল,

আমারই এই অস্পষ্ট চিন্তাজালের মত! থেকে-থেকে দক্ষিণ বাতাসের এক-একটা হিল্লোল যেন পাখার বাতাসকে লজ্জা দিয়ে হেসে চ'লে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ এমনি ক'রে পড়ে থাকার 'পর কেমন যেন একটা অবসন্নতা এল এবং নিদ্রাদেবীর আসন্ন আগমন বুঝতে পেরে পাশ ফিরে চোখ বোজবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ কি একটা শব্দে ফিরে দেখ্‌লুম। প্রথমটা অন্ধকারে ঠিক দেখা গেল না, তারপর মনে হোল বারান্দার ওপর দিয়ে কে-একজন চ'লে গেল।...স্ত্রীমূর্ত্তিই ব'লে মনে হ'ল।...কোথায় গেল? কে গেল? পাশের ঘরে বৌঠান থাকেন! নিশ্চয়ই তিনি! এত রাত্রে অমন ক'রে কোথায় গেলেন? ....ছাদের সিঁড়ির দিকে নয় ত?

হঠাৎ বুকের মধ্যে একসঙ্গে অনেক কথা ঠেলাঠেলি ক'রে উঠ্‌ল।... তবে কি সত্যই তাই? তা'হলে তো কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়!

তাড়াতাড়ি ধড়মড় ক'রে উঠে যথাসম্ভব নিঃশব্দে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম।...বরাবর ওদিক দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেলুম।

কিন্তু কৈ, কোথাও তো কেউ নেই! চারিদিক মড়ার মত নিঝুম! নিদ্রিতা রজনীর বুকে কোথাও এতটুকু স্পন্দনও যেন টের পাওয়া যাচ্ছে না!

... ...আবার নীচে নেমে এলুম।...অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এসে আমার পাশের ঘরের দরজায় চাপ দিয়ে দেখলুম, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ! ....

প্রবল স্বস্তির নিঃশ্বাস আমার বুকখানা হাল্কা ক'রে বেরিয়ে এল।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে এই একটা সত্যকে যেন কিছুতেই আমি প্রাণের সঙ্গে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লুম না যে, আমারই উত্তপ্ত মস্তিষ্কের এক অদ্ভুত কল্পনার পিছনে আমি এইমাত্র ছুটে গিয়েছিলুম!...হঠাৎ আমার এ কি খেয়াল!... ... এ কী পাগলামী আমাকে পেয়ে বস্‌লো!

তখনি আবার মনের ভেতর থেকে কে প্রতিবাদের সুরে ব'লে উঠ্‌ল—সতর্কতার মার নেই। যদি সত্যই ও বৌঠান হতেন এবং আত্মহত্যার সঙ্কল্প ক'রে এই নিসূতি রাত্রে ছাদে উঠে যেতেন, তা'হলে এখন যেটাকে আমার পাগলামী মনে করছি, সেই পাগ্‌লামীর ফলেই মস্ত বড় একটা জীবন রক্ষা পেয়ে যেত!

সারারাত আর নিদ্রা হোল' না।... মস্তিষ্কের ভিতর রাশি-রাশি অসংলগ্ন চিন্তা—বুকের নীচে একটা নিশ্বাস-চাপা বদ্ধবায়ু—এই দুয়ের মাঝখানে প'ড়ে সে যন্ত্রণাময় রাত্রির অবসান হ'য়ে গেল।

উমার কথা

কি অদ্ভুত জায়গা এই পৃথিবী! যে আমার অতি আপনার, একই রক্ত ধ'রে যাদের সঙ্গে সম্পর্ক, সে হোল আমার মরণ-শত্রু, আর যাদের কোনকালে কোনদিন জানি না, চিনি না, যাদের সঙ্গে কোনদিক দিয়ে কোন সম্বন্ধই নেই, তারা আমার যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচিত পরমাত্মীয়!

ভাগ্যে তখন তাঁর কথা শুনে কাকার কাছে ফিরে যাইনি! এঁরা আমায় এত আদর, এত যত্নে রেখেছেন, তবু রাতদিন কি তুষানলে জ্বলে যাচ্ছি! সেখানে গেলে কি করতুম?

তবে হ্যাঁ, সেখানে গেলে হয়ত এই একটা সুবিধা হোত যে, কাকা আর কাকীমার দয়ায় শিগ্‌গীর এ অভিশপ্ত প্রাণটা বেরুবার সম্ভাবনা থাকৃত!

কেন যে এঁরা এ হতভাগীর জন্যে এত করেন, তাতো কিছু

বুঝ্‌তে পারিনি! মনে হয়, এ সংসার যেন দেবতার সংসার। প্রভাতবাবু ত শিবতুল্য মানুষ, ভাগ্যগুণে বউও হয়েছে যেন সাক্ষাৎ করুণাময়ী। আর নিশীথ; স্নেহ, মমতা, রঙ্গ হাসিতে মিশিয়ে সে যেন এক অপূর্ব্ব জিনিষ! আমার দুঃখকষ্ট ঘোচাবার জন্যে ওর অন্তরে-অন্তরে কত চেষ্টা তা আমি সব বুঝ্‌তে পারি! আমায় কখনো শুক্‌নো মুখে ব'সে থাক্‌তে দেখলে সে এমন একটা-না একটা বিদ্‌ঘুটে কথা পেড়ে বস্‌বে যে, না হেসে কোনমতে পারা যায় না!...সত্যিই এদের সংসার দেখ্‌লে প্রাণ জুড়িয়ে যায়! ... ...

এমনি ত থাকি বেশ, কিন্তু যখনি একলা থাকি, নিজের কথা মনে কর্‌তে গিয়ে অকূল পাথারে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তখন প্রাণ যেন খাঁচার পাখীর মত কাতর হয়ে ছট্‌ফট কর্‌তে থাকে। তখনি মনে হয়, বেরিয়ে পড়ি এদের এই সোণার খাঁচার শিকল কেটে! কপালে যা' আছে, তা তো ঐ চোখের সামনে বড় বড় রক্তের অক্ষরে লেখা রয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তবে আর কেন? এই কটা গণা দিনের জন্যে কেন এমন ক'রে পিছিয়ে পড়ে থাক্‌ব! শেষের ক'টা দিন আশ মিটিয়ে সেবা ক'রে নোব, তা থেকেই বা কেন বঞ্চিত থাকি! ... ...

সেখান থেকে খবর যা' আস্‌ছে, তাতে ভালোর চিহ্ন ত কোথাও এতটুকু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। কৈ, আমিই যদি তাঁর জীবনের এতবড় শত্রু, আমি তো সঙ্গে নেই, তবু কেন তিনি ভাল হয়ে উঠ্‌ছেন না!

হায় রে, আমি তাঁর শত্রু! আমায় ছেড়ে তাঁর যে একটা দণ্ডও চলে না! ভালো হবেন কেমন করে!...কিন্তু সে কথা এদের বোঝাই কি ব'লে! স্ত্রী ত আমি! পশুর ক্ষুধাটাই কি এত বড় যে—

কিন্তু থাক্, অনর্থক অনুযোগ করে লাভ কি! কিরণ দিদি তো বলেও ছিল সে কথা, কিন্তু প্রভাতবাবু বলেন, ডাক্তারী শাস্ত্রে না কি বলেছে, হাজার ওষুধ আর হাওয়া খেয়ে যে কাজটুকু করবে, এসব অসুখে স্ত্রী কাছে থাকলেই তার ঢের বেশী ক্ষতি করবে! এর ওপর তো কথা চলে না!...তাই চুপ করেই থাকি!

নিশীথ কিন্তু যেন আমার মনের সকল কথা বোঝে! তাই সেদিন বলেছিল—দাদা যা'ই কেন বলুন না বৌঠান, অমার মনে হয়, তোমার সেখানে যাওয়াই উচিত ছিল!

তার সে সহানুভূতির জবাব আমি কোন কিছুই দিতে পারিনি, কেন না তার জবাব দিতে গেলেই আমার চোখের জল চেপে রাখা ভার হ'য়ে উঠ্‌তো!

......এই নিশীথের প্রাণে যেন ভগবান্ সকল লোকের জন্যে সমবেদনা জমা করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার সঙ্গে যতক্ষণ কথা কই, ততক্ষণ প্রাণের ভিতর যেন আর সে হাহাকার থাকে না। কিরণদিদি যে বলে, আমার ঠাকুরপো দেবর লক্ষ্মণ, সতিাই তাই! এমন ছেলে-মানুষের মত মিষ্টি স্বভাব, অথচ এমন বুদ্ধি ক'জনের থাকে?

এমনি মানুষের রীতি, দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার যার কোনদিকেই কূল কিনারা নেই, সেও যদি ঐ পাহাড়-প্রমাণ দুঃখকষ্টের বোঝা নামিয়ে দেবার একখানা সমবেদনাভরা মুক্ত হৃদয়ের সন্ধান পায়, তাহলে সেও একটু আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচে! অথচ, ভেবে দেখ্‌তে গেলে মনে হয়, যে মাঝ-গঙ্গায় পড়ে ভরাডুবি হ'তে বসেছে, তার কাছে এই সমবেদনা-সহানুভূতির দাম কি? কিছুই তো নয়! আমার

কপাল চিরজন্মের মত ভাঙ্গতে চলেছে, তা সে কি দুটো 'আহা-উহু' কথাতেই জোড়া লেগে যাবে? মানুষ তো ছার; আমার দুঃখ ঘোচাবার সাধ্য বুঝি দেবতারও নেই!

...বুঝি তো সবই! তবু প্রাণের ভিতর রাত্রিদিন এই তীব্র হাহাকার, এই সহস্র সরীসৃপের কঠোর দংশন, এ যাতনার এককণাও উপশম করবার জন্যে চারিদিকে হাতড়ে মরি! এক-এক করে আমার ছেলেবেলা থেকে এই যোল-সতের বচ্ছরের কথাগুলো যখন মনে করি, তখন নিজেরই মনে হয়, এই রকম কিছুদিন ভাবতে গেলে আমি পাগল হ'য়ে যাবো!

এ সংসারে রূপ নিয়ে সকলে জন্মাতে পারে না, কত লোকে বলে সে একটা মস্ত বড় দুর্ভাগ্য! কিন্তু, আমি—আমি এই রূপের সৌভাগ্য নিয়ে এসেই বা সংসারের কাছ থেকে কি পেয়েছি! বাবা-মা আমার মারা গেছেন ছেলেবেলাতেই, সে কি আমার দোষ? বাপ-মা তো: অনেক মেয়েরই থাকে না। কিন্তু তাই বলে কোন্ নৃশংস মানুষ একটা জলজ্যান্ত জীবকে এমন ক'রে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিতে পারে! ওঁর তো দোষ ছিল না, কাকা-কাকীমা পেড়াপীড়ি করায় তিনি তাদের নিজের অসুখের কথা জানিয়েছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও—

না না না, আবার সে চিন্তা কেন! যা হ'য়ে গেছে, তাতো হ'য়ে গিয়েছেই! দোষ কারো নয়, দোষ আমারই! এত রাশি রাশি দুর্ভাগ্যের বোঝা ঘাড়ে ক'রে আজ পর্য্যন্ত কোন্ মেয়ে সংসারে এসেছে? নইলে বাবা-মা'ই বা অত শীগ্গীর আমায় ছেড়ে যাবেন কেন?

হ্যাঁ, সব দোষ আমারই! সাবিত্রীও তো স্বামীর আসন্ন মৃত্যু জেনে-শুনে তাঁর গলায় মালা দিয়েছিলেন। নিজের সতীত্বের জোরে তাঁর স্বামীকে বাঁচিয়েও তুলেছিলেন! আমি কি পারি নে?

মনের খেয়াল শুনে হাসিও পায়, দুঃখও ধরে! ওরে পাগল! তিনি যে ছিলেন দেবী!

কিন্তু দিনরাত এই অমঙ্গলের চিন্তা আমার মন থেকে সরতে চায় না কেন? অসুখ যে ভালো হবে না, তারও তো কোন লেখাপড়া নেই? প্রভাতবাবুর মা বলছিলেন, কোথায় কাদের বাড়ীতে একজন এক বছর জ্বরে ভুগেও ভাল হ'য়ে উঠেচে! তা, আমার কপালেই বা তা কেন হবে না? আমার অমন স্বামী, ঐ বুকভরা ভালবাসা, ভগবান কি আমার কপালে এসব লিখেও এত শীঘ্রই তা মুছে ফেলেছেন!...না না, আমি এমন ক'রে বিশ্বাস হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে বস্‌বো না! তাহ'লে আর বাঁচবো কি নিয়ে?

নিশীথও সেদিন ঠিক এই কথাই বলেছিল। বল্‌ছিল—বৌঠান, এ সংসারে কোন্‌ দিক্‌ দিয়ে কখন কি আশ্চর্য্য জিনিষ ঘটে যায়, মানুষ কি তার ঠিক ঠিকানা করতে পারে? আশাকে লোকে কুহকিনী বলে বলুক, কিন্তু তবু আশার আদর তো কই কমে যাচ্ছে না! মানুষের বেঁচে থাক্‌তে হ'লে ঐ আশা হারালে কখনোই চলে না।

ভেবে দেখ্‌চি, কথাটা খাঁটি সত্যি! ... ...

নিশীথ যে কথাগুলি বলে, ভেবে দেখ্‌লে বোঝা যায়, তার ভেতর কত জিনিষ আছে। তার মতের সঙ্গে আমাদের মতের ঠিক খাপ্‌ না খেলেও এটুকু বুঝতে পারি যে, সে আমাদের চেয়ে কত বেশী বোঝে!

তাই তার কথায় আমি বড় একটা প্রতিবাদ করি না। যদি কোন কথা তার বেখাপ্পা বা খারাপ লাগে, তাহ'লে মনে হয় সেটা আমাদের না-বোঝার দোষ, তার দোষ নয়!

কি কথায়-কথায় সেদিন বলেছিলুম—মেয়েমানুষ সংসারের মধ্যে একটা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই নয়; তা তাতে তার কি রাগ; কিন্তু তার প্রতিবাদে সে যে সব কথা ব'লে গেল, ক'জন পুরুষ মেয়েদের অত উঁচু আসন দিতে পেরেছে? তা যদি দিত, তাহলে আর ভাবনা কি ছিল?

নিশীথ বলে, আজকাল না কি এই অধঃপতিত স্ত্রীজাতিটাকে টেনে তোল্‌বার জন্যে একদল লোক উঠে পড়ে লেগেছেন।

হেসে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—তার মধ্যে তুমিও একজন না কি?

সে গম্ভীর হ'য়ে বলেছিল—সে কথা মুখে বল্‌লে যে তোমার কাছে গৌরব জাহির করা হবে বৌঠান! তবে এইটুকু বল্‌তে পারি, যদি আমি আমাদের মেয়েদের দুঃখ কষ্ট নিবারণ করবার জন্যে এক অণু পরিমাণ সাহায্যও কর্‌তে পারি, তা'হলে মনে কর্‌ব, আমার এই জীবনের মধ্যে একটা বড় রকমের উদ্দেশ্য আমি সাধন কর্‌লুম।

আমি মুখ টিপে-টিপে শুধু হাস্‌তে লাগলুম। সে একটু যেন বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে—তুমি হাস্‌চ, মনে কর্‌চ, কি পাগলের মতন আমি বক্‌ছি! কিন্তু ঐটুকুই আমার সবচেয়ে অনুশোচনার কথা ব'লে মনে হয় বৌঠান যে, নারী হ'য়েও তোমাদের জাতের এই রাশি রাশি দুঃখ দুর্দ্দশার সম্বন্ধে তোমরা আজ একেবারেই অজ্ঞ! কি তোমাদের অভাব,

সমাজের কি কঠোর পীড়নে তোমরা দিন-দিন নিষ্পেষিত হ'চ্ছ, এসব কথা তোমরা জান্‌তেও চাও না, বুঝ্‌তেও চাও না!

আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লুম—মেনে নিলুম। তবে বুঝ্‌তে যে চাই না, তার কারণ, বুঝে কোন উপায় নেই বলেই!

সে বলে উঠ্‌লো—স্বীকার কর্‌তে পারলুম না। চেষ্টা করলে উপায় তার হবেই!

আমি কথাটা চাপা দেবার জন্য বললুম—তা বেশ তো, কর না চেষ্টা, একটা নাম থেকে যাবে!

তারপর কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বল্‌লুম—আচ্ছা কৈ, সেদিন কি ছবি আঁক্‌ছিলে, তা আমায় দেখালে না?

সে একটু চুপ ক'রে থেকে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে ব'লে উঠ্‌ল—বাঃ, সব ছবিই কি দেখাতে হয়? না, সে ছবি দেখাবো না।

বললুম—তা বেশ; না দেখালে তো আর জোর করে দেখ্‌তে পারিনে!...দিদি বলেন বড় মিথ্যে নয়!

—কি বলে?

দিদি বলেন—ঠাকুরপোর ক'নের সাধ ঐ ছবির ভেতর দিয়েই মিটছে! মুখে না ব'লে নিজের পছন্দসই ক'নের ছবি ঐ পটের ওপর এঁকে দেয়!...তা এই নতুন ছবিখানা বোধ হয় তাই?

কি-জানি-কেন হঠাৎ সে যেন খুব বেশী রাগ করেছে ব'লে মনে হল। একবার আমার মুখের পানে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়েই মাথা হেঁট করলে। আমি আরও কিছু বল্‌তে যাচ্ছিলুম, এমন সময় কিরণদিদি ঘরে ঢুকে বল্লেন, তোর একখানা চিঠি এসেছে, বোধ হয় পুরী থেকেই!

...আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।...তাঁর চিঠি পড়ে আমার বুকের রক্ত জল হ'য়ে গেল।

তিনি লিখেছেন, জ্বরের অবস্থা সেই রকমই, কিন্তু শরীরের অবস্থা ঢের বেশী খারাপ! নড়বার-চড়বার শক্তিও বড় নেই!...আর আমি কোনোমতেই এখানে থাক্‌তে পার্‌ছি না; সমুদ্র তার বিকট গর্জ্জন আর তরঙ্গগুলো নিয়ে মনে হয় যেন আমাকেই গিলে ফেল্‌বার জন্যে তীরের কাছে ছুটে আস্‌ছে!...উমা! হয় তুমি এখানে এসো, নয় তো, আর আমার হাওয়া খেয়ে কাজ নেই, আমায় সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে চল! তোমায় না-দেখে যদি আমায় এইখানেই...

চোখের জলে চিঠির অক্ষরগুলো ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠ্‌ল! বুকের ভেতর যেন তার আকুল কান্না শুন্‌তে পেলুম। চিঠিখানা বুকের উপর চেপে অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটাকে মাটীর ওপর চেপে ধর্‌লুম।

কিরণদিদি ঘরে ঢুকে বল্লেন—ওমা, একি!...ছিঃ কি হ'য়েছে ভাই! লক্ষ্মীটি, শোন্ দেখি—

আমি ছেলেমানুষের মত তার কোলের ওপর মাথা গুঁজে বললুম—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, তোমরা আমায় সেখানে পাঠিয়ে দাও, শেষের ক'টা দিন, তাও কি তোমরা আমাদের দেখা হ'তে দেবে না?

কিরণদিদি আমার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে আমায় আশ্বাস দেবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু সে আশ্বাসে কোন ফলই হোল না। আমি বল্‌লুম—কোন কথাই আমি শুন্‌বো না দিদি! আমায় সেখানে যেতে না দিলে আমি খাওয়া-দাওয়া সব ত্যাগ কর্‌ব! দেখ্‌ব, তাতেও তোমাদের দয়া হয় কি না!

আমার কথা শুনে তিনি বেশ একটু ভাবনায় প'ড়ে গেলেন। মাও সব শুনে বল্লেন—কিন্তু প্রভাত তো বাড়ী নেই, কবে আস্‌বে তাও তো ব'লে যায় নি কিছু! কি ক'রে কি হ্‌বে মা!

কিন্তু আমার তখন অত কথা ভাব্‌বার শক্তি সামর্থ্য ছিল না। বুঁজে আমি সত্যই খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করলুম।

শেষে মা বল্লেন, আচ্ছা, তুমি খাও, আমি বল্‌চি, কালই তোমায় আমি সেখানে পাঠিয়ে দোব। মায়ের কথা, বিশ্বাস কর মা, খাও!... নিশীথকে বল্‌চি, কালই তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে সে সেখানে রেখে আস্‌বে। প্রভাত এলে আমরা তাকে সব কথা বুঝিয়ে বল্‌বো এখন!

আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলুম।

মা নিশীথকে ডেকে সব কথা বল্লেন। নিশীথ কিন্তু শুনে হঠাৎ যেন ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। পরে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বল্‌লে—ওসব আমি পারব না মা।

পারবে না?...নিশীথও আমার এই উপকারটুকু করতে পারবে না, সে কথা স্পষ্ট বল্লে? তা'হলে তার ঐ অত বড়-বড় সমবেদনা সহানুভূতির কথা সব মিথ্যা—সব ভুয়ো? ... ...

নিশীথ ঘরে ছিল। বরাবর সেখানে গিয়ে বল্‌লুম—তুমিও আমার এই কাজটুকু কর্‌তে পার্‌বে না ঠাকুরপো? আমি কি এত বড় ভার যে, এই পথটুকু নিয়ে যেতে তোমার এতই কষ্ট বোধ হ্‌চ্ছে?

নিশীথ কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইল। তার সমস্ত শরীর যেন মাটীতে গড়া, আমার কথার কোন সাড়াই তার কাছ থেকে পাওয়া গেল না। আমি মনে-মনে রাগ চেপে বল্‌লুম, ঠাকুরপো, শুন্‌চ?

হঠাৎ নিশীথ যেন চম্‌কে উঠে আমার মুখের পানে কট্‌মট্‌ ক'রে তাকিয়ে রইল। বল্‌লে—শুনিচি সব, কিন্তু কর্ত্তব্য কি, তা ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না। সত্যিই কি তুমি যেতে চাও?

সে কথা তো আমি এই এতবার ক'রে বল্‌ছি।

নিশীথ যেন নিজের শরীরকে প্রবল ভাবে ঝাঁকানি দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—বেশ, চল।...আজই? না, কাল?

তার কথা বল্‌বার ধরণে আমার কেমন থতমত লাগ্‌লো, একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়ে বল্‌লুম—আজ সময় আছে?

নিশীথ একটু ভেবে বল্‌লে—না, আজ তো সন্ধ্যে হ'য়ে গেল; আজ আর হয় না, কাল!...বেশ, কালই!

আমি খুসী হ'য়ে মাকে জানালুম যে, নিশীথ ঠাকুরপো রাজী হ'য়েছে!

* *

*

রাত্রি ৮টা না ৯টার সময় ট্রেণ। একখানা দিব্যি চক্‌চকে ঘরে নিশীথ আমায় তুলে দিলে। আমি বল্‌লুম—বাঃ, এ দিব্যি খালি গাড়ী তো!

নিশীথ বল্লে—এ গাড়ী খালিই থাক্‌বে। এ ঘরখানার পুরো ভাড়া আমিই দিয়েছি! নইলে দেখ্‌চো ত অপর সব গাড়ীতে কি কিচিমিচি! তার ভেতরে তোমার ভারি কষ্ট হোত যে! এই গদীটার ওপর কম্বল-খানা বিছিয়ে দিই, কেমন?

বুকের আগুন

—না না, থাক্‌, আমিই পেতে নিচ্ছি!...এত বড় গাড়ীর পুরো ভাড়া দিতে হ'ল? অনেক টাকা লাগ্‌লো তো?

নিশীথ বল্লে—সে কথায় তোমার কাজ কি বল দিকিন? ব'লে সে নিজেই মাঝের গদীটার ওপর কম্বল আর চাদর বিছিয়ে দিতে লাগ্‌ল; পরে বল্‌লে, বোস এইখানে, আর এই বালিসটা নাও, দরকার হ'লে মাথায় দিয়ে দিব্যি ঘুমুতে পার্‌বে!

পাছে আমার ভিড়ের মধ্যে কষ্ট হয় একটু, তার জন্যে নিশীথ কত পয়সাই না খরচা করেছে! তার ওপর আবার সে নিজে আমার জন্যে বিছানা পেতে দিতে আমার কেমন ভারী লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল। মাথাটা নীচু ক'রে বিছানার ওপর বসে পড়লুম।

সে দরজা খুলে নীচেয় নেমে বোধ হয় গাড়ী ছাড়বার অপেক্ষা করতে লাগল। আমি এক পাশে ব'সে ব'সে সেখানে—পুরীতে স্বামী এতক্ষণ কি কর্‌ছেন—কেমন আছেন, সেই সব চিন্তায় মগ্ন হবার চেষ্টা করছিলুম; কিন্তু বাধা পেলুম। নিশীথ একটা কাঁচের গেলাসে ক'রে লেমনেড নিয়ে এসে আমার সামনে ধর্‌লে।

আমি বল্‌লুম, কি হবে?

সে বল্‌লে, খেয়ে নাও, ট্রেণ তো এখন অনেকক্ষণ কোথাও দাঁড়াবে না, তেষ্টা পেলে ভারী কষ্ট হবে। আর এই পান ক'টা নাও।

আমি পানের দোনাগুলো নিয়ে বললুম—আমার তো তেষ্টা পায় নি। তুমিই খাও—

নিশীথ বল্‌লে—আমি তো খেয়েচি! এটা তোমার জন্যে নিলুম যে!

আর আমি আপত্তি কর্‌তে পারলুম না। গেলাসের জলটুকু শেষ ক'রে তার হাতে গেলাস ফিরিয়ে দিলুম। মনে-মনে আবার কেমন একটা লজ্জা এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু ক্ষীণ তৃপ্তি আমার বুকের ভেতর অনুভব করলুম।...নিশীথের যেন সব-তাতেই বাড়াবাড়ি! রাস্তায় বেরুলে একটু আধটু কষ্ট কার কবে না হয় গা?

ট্রেণ হু-হু করে মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে সুরু করেছে; আমি শুয়ে-শুয়ে কত কি ভাবচি। ...সেখানে গিয়ে কি দেখ্‌ব। দেখ্‌ব, আমার স্বামী শয্যাগত, হতাশভাবে শেষের দিনটীর অপেক্ষা কর্‌ছেন? আমায় দেখে, হয়ত তিনি খুব বেশী উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌বেন। হয়ত শীর্ণ হাতদুখানি দিয়ে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে বল্‌বেন, উমা তোমারই পথ চেয়ে চেয়ে আমি এত বেশী শীর্ণ হয়ে গেছি!...আমি কি বল্‌বো? কেবল চোখের জল ফেলা ছাড়া কি-ই বা আমার বল্‌বার আছে!

কাছে ত যাচ্ছি, কিন্তু সেখানেও হয়ত ডাক্তার আমাকে তাঁর কাছে বড় বেশী ঘেঁসতে দেবেন না!

রাত্তিরে তিনি একা পড়ে রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌বেন, অথচ, আমাকে তাঁর কাছে থাকতে দেওয়া হবে না! আমার কথা না-হয় ছেড়েই দিই, তাঁরও কি তাতে বেশী কষ্ট হবে না! বর্দ্ধমানের বাড়ী থেকে আসবার আগে যে ক'দিন আমি অন্য ঘরে শুয়েছিলুম, সে ক'দিন তিনি রাত্রে একদম্ ঘুমুতে পার্‌তেন না!...এক-একদিন চুপি-চুপি আমার কাছে ছুটে আসতেন!

ভাব্‌তে-ভাব্‌তে মন যেন আমার আর এক নূতন সমস্যায় ডুবে যেতে লাগ্‌ল। তবে কি এমন ক'রে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বেরিয়ে

পড়ে ভুলই করলুম ! এখন সত্যিই দূরে ছিলুম, কাছে গিয়েও দূরে দূরে থাকলে তাঁর কষ্ট বাড়বে বই কমবে না। ত !... ...

নিশীথ ওপাশে নিস্পন্দের মত বসেছিল। মুখ তুলে তাকে দেখে আমার মনে হোল, সেও যেন আমারই মত কি-এক চিন্তায় তন্ময় হ'য়ে আছে ! বুঝতে পারলুম না, তার এত কিসের চিন্তা !... ...

এরকম মুখ বুঁজে-বুঁজে যেতে আমার কেমন ভাল লাগল না। তা ছাড়া, কেবল ঐ একঘেয়ে চিন্তা ; ঐ রোগের স্বপ্ন, মৃত্যুর বিভীষিকা, আসন্ন বৈধব্যের আতঙ্ক, তাদের কথা ভেবে-ভেবে হৃদয়ের আগোগোড়া যেন বিষিয়ে উঠেছে ! তার চেয়ে ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা কয়ে যদি খানিক ভুলে থাকতে পারা যায়, সেইটুকুই লাভ !

খানিকটা উঠে বসে বললুম—ঠাকুরপো যে বসে বসেই ঘুমুতে সুরু করলে ?

সে যেন ধড়মড় করে' গাঝাড়া দিয়ে বসল। কৈ, না ! তুমি ঘুমুচ্ছিলে কি না—

—বা-রে ! কৈ আবার আমি ঘুমোচ্ছিলুম ! ভাবনা তো আমারই একচেটে ব'লে আমি জানি ; কিন্তু তুমি গুম হ'য়ে এত কি ভাবছ বল তো ?

সে বললে—ভাবনা কম-বেশী সকলেরই আছে। তুমি ভাবছ, তোমারই ভাবনা খুব বেশী, কিন্তু আমার ভেতরে যে কি আছে, তা তো আর তুমি জানো না !

আমি হেসে বললুম—তোমার ভেতরে আবার ভাবনা চিন্তা কিসের ? তোমার ভাবনার মধ্যে তো এক ছবির কল্পনা ! তবে অবশ্য

যদি তার সঙ্গে বিয়ের ভাবনাও এসে জোট পাকিয়ে থাকে, তা'হলে সে আলাদা কথা!

সে বাইরের পানে চেয়ে শুধু বল্লে—তা হ'তেও তো পারে!

আমি একটু বিরক্তির সুরে বললুম—না, তুমিও দেখ্‌চি আমার সঙ্গে কথা-কওয়া বন্ধ ক'রে দিলে!

সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে এসে আমার সামনের বেঞ্চে বসে বল্লে—বা-রে! আমি আবার কথা-কওয়া বন্ধ ক'রে দোব! কিন্তু আমি ভাব্‌চি—

—কি?

—এই রকম ক'রে চ'লে আসাতে দাদা যদি রাগ করেন, যদি—

—কেন? রাগ কর্‌বেন কেন? মা আমায় আস্‌তে বলেছেন ত! এতে রাগ করবার কি আছে?

সে একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লে—ঠিক তার জন্মেও যদি রাগ না করেন, এই একা আমার সঙ্গে তোমার আসাটা তিনি ঠিক সমর্থন করবেন কি না—

তার কথার ভেতরকার ইঙ্গিতে লজ্জায় আমার মুখ-চোখ তেতে উঠ্‌ল। খানিক চুপ ক'রে থেকে বল্লুম—কি যে তুমি বল ঠাকুরপো! তোমাকে তোমার দাদা সন্দেহ করবেন?

—তা, আশ্চর্য্য কি?

আমি রাগ ক'রে বললুম—সন্দেহ করবার কারণ থাক্‌লে আমি নিজেই কি আসতুম?

সে আর কিছু বল্‌লে না। আমিও আবার কি বলে কথা সুরু

করবো, সহজে ভেবে পেলুম না। হঠাৎ কোথাকার কি এক বাজে কথায় মনটা যেন অনেকখানি সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠেছিল।... ...

অনেকক্ষণ এমনি ক'রে কাটল। ব'সে ব'সে বিরক্ত হ'য়ে শুয়ে পড়বার যোগাড় করছি, নিশীথ বল্লে, ঘুম আস্ছে বুঝি?

—না, শুয়ে থাকি একটু; তুমি তো ভাল ক'রে কথাই কচ্ছ না?

—কি রকম? আমি কথা কচ্ছি না?

—তা নয়ত কি? কথা বন্ধ করবার জন্যেই ত ঐ কি ছাই-ভস্ম কথা তুলে বস্লে!

নিশীথ মিনতির কণ্ঠে বল্লে—তার জন্যে রাগ করলে বুঝি তুমি? আচ্ছা, ঘাট হ'য়েছে আমার, মাপ কর, তোমার পায়ে পড়ি!

তার এই ছেলেমানুষের মত মাপ-চাওয়ার রকম দেখে আমি হেসে ফেল্লুম; থাক্ থাক্, খুব হ'য়েচে!...তুমি এমনি ছেলেমানুষ!

নিশীথ একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লে—একখানা বই এনেছি, পড়বে?

—তুমিই পড়, শুনি!

নিশীথ উঠে তার চামড়ার বড় ব্যাগটা খুলে একখানা চক্‌চকে বই বের করলে। একখানা নতুন বাংলা উপন্যাস। সে পড়তে সুরু করলে। আমি শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলুম।

খানিকটা দূর পর্য্যন্ত পড়েই সে হঠাৎ বই বন্ধ ক'রে বল্লে, একটা মজার জিনিষ পেয়েছি।

আমি মুখ তুলে বললুম—কি?

সে বল্লে—না, আগে তুমি বল, তুমি রাগ করবে না? তবেই দেখাবো, নইলে নয়!

—বাপ্ রে! তোমার সব-তাতেই বাড়াবাড়ি! কি এমন জিনিষ যে, তিন সত্যি না করলে দেখ্‌বার অধিকার পাওয়া যাবে না? আচ্ছা, রাগ করবো না; দেখি, তোমার বহুমূল্য জিনিষটা!

নিশীথ বল্লে—সেই ছবিখানা, যেটা তুমি সেদিন দেখতে চেয়েছিলে, আমি দেখাইনি!

আমি তাড়াতাড়ি উৎফুল্ল হ'য়ে বললুম, ও, তোমার সেই ক'নের ছবি? ব'লে সেটা নেবার জন্যে হাত বাড়াতেই, সে আমার মুখের পানে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লে, আগে মানুষটাকে দেখে তারপর যা বল্‌বার হয় ব'লো!

... ছবি হাতে নিয়ে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। আমার অসংযত রসনাকে বারম্বার অভিশাপ দিতে লাগলুম। সমস্ত মুখখানা কাণ দুটো পর্য্যন্ত গরম হ'য়ে উঠ্‌ল। মুখ তুলে চাইবার শক্তি আমার একবিন্দু হ'ল না।

নিশীথ বল্লে—চিন্‌তে পারছ লোকটাকে?

আমি মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম—ভারী দুষ্টু তুমি! এ ছবি তুমি কেন আঁক্‌তে গেলে?

নিশীথ একটু আমতা-আমতা ক'রে বল্লে—কেন, তা ঠিক বল্‌তে পারি নে! তবে অনেকদিন থেকে ইচ্ছে হয়েছিল; অনেকদিন ভেবেছিলুম, হয়ত অন্যায় হবে, হয়ত তুমি ভয়ঙ্কর রাগ করবে। কিন্তু এখন তুমি শপথ করেছ, এখন রাগ করলে সত্যভঙ্গের দায়ে পড়তে হবে।

আমার মুখে কোন জবাব এল না। আর যাই হোক্, ছবিখানি যে ভারী চমৎকার হ'য়েছিল, সে কথা যে দেখ্‌বে, তাকেই স্বীকার

করতে হবে। নিজের রূপকে আমি এমন ভাল ক'রে খুঁটিয়ে কোন দিন দেখিনি, যেমন এই ছবিখানির ভেতর আজ দেখ্‌চি! আমার যে এত রূপ, তা যেন আমি নিজেই কোনোদিন খেয়াল করিনি! এক একবার নিশীথের ওপর রাগ করবার ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌ল।...মাগো! এমন জান্‌লে কখ্‌খনো আমি এ দুষ্টু লোকটার কাছে আমার মুখের কাপড় খুল্‌তুম্‌ না। কিন্তু ছবিখানি দেখে, তার আঁকবার ক্ষমতা দেখে সব রাগ আমার নিভে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আমি মুখ তুলে বল্‌লুম—তা, অনর্থক এত কষ্ট করে এত রঙ খরচ ক'রে এ ছবি এঁকে কি লাভ? কি হবে এ?

নিশীথ একটুখানি হেসে বল্‌লে—সেটার মীমাংসা ছবির মালিকের করাই উচিত নয় কি?

আমি অপ্রতিভ হ'য়ে বললুম—তা তো আর আমি না বল্লিনি! আর তোমার এ ছবি দাবীও কর্চ্ছিনি!

—মনে করেছি, এখানা খুব ভাল ক'রে বাঁধিয়ে আমার ঘরে রেখে দোব।

আবার এক ঝলক তপ্ত রক্ত আমার সারা মুখখানায় ঠেলে উঠল। খানিক নীরব থেকে বললুম—তা মন্দ নয়! যখন ম'রে যাবো, তখন তবু ওটা দেখ্‌লে, তোমাদের সকলের এ হতভাগীর কথা মনে পড়বে!

নিশীথ অনুযোগের কণ্ঠে বল্লে—আবার ঐ সব সুরু করলে?...না, শোন, তারপর পড়ি!

আবার বইখানা খুলে সে পড়তে সুরু করলে। অনেকগুলো পাতা সে প'ড়ে গেল, কিন্তু আস্তে আস্তে ঘুমের আবেশে আমার চোখ জড়িয়ে

আস্‌তে লাগ্‌ল। তারপর ঠিক কোন্ সময়টীতে আমি অগাধে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, সে কথা বল্‌তে পারি না।... ...

একটানা বোধ হয় অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম। তার মাঝে কত স্বপ্ন! সে স্বপ্ন কি ভয়ানক!...যেন আমার সব গিয়েছে! আমার শেষ সম্বল সিঁথির সিঁদুর হাতের নোয়া সব ছেড়ে ছুড়ে আমি থান কাপড় পরে মেঝের ওপর লুটিয়ে-লুটিয়ে কাঁদ্‌ছি, চারিপাশে আমার কেউ কোথাও নেই! শুধু অনেক দূরে শুষ্ক ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একা নিশীথ! আমার এই অবস্থা দেখে সে পলকহীন দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রয়েছে; আর দর্‌দর্‌ ক'রে চোখের জল তার গাল গড়িয়ে পড়ছে! এত দুঃখের মাঝেও আমার মনে হ'ল, ঐ একটী লোক, সমস্ত সংসারের মধ্যে আমার দরদে দরদী! কথাটা মনে করেও যেন আমার বুকের গভীর অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোকের ক্ষীণ রশ্মি দেখ্‌তে পেলুম।

...যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখন হঠাৎ চোখ চেয়েই চম্‌কে উঠ্‌লুম। ...ছি ছি! নিশীথ আমার পায়ের তলায় বসে...আমার দুখানা পা তার কোলের উপর তুলে নিয়ে... ...

ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে পাদুটো গুটিয়ে নিয়ে বললুম—ছি ছি, এ কী ছেলেমানুষী করছ ঠাকুরপো?

নিশীথ একটা ভারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—তোমায় জাগিয়ে দিলুম?...আমি—আমি—

এমনি লজ্জা করছিল, কি বল্‌বো!...বল্‌লুম, তুমি আমার চেয়ে বয়সে কত বড়, আর আমার পায়ে হাত দিলে কি ব'লে? ভারী ছেলে-মানুষ তুমি!

নিশীথ যেন কেমন আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে বল্‌লে—আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগ্‌ছিল! ইচ্ছে হচ্ছিল—ইচ্ছে হচ্ছিল... ...

তার কথার ভাবে—তার মুখের ভঙ্গীতে ক্রমশঃ ভারী বিস্ময় হ'তে লাগল। বললুম—কি?

সে বলে উঠ্‌ল, মনে হচ্ছিল, ঐ পা-দুখানিকে আমার বুকের ওপরে ধরি উমা!

আমার হৃদয়ের স্পন্দন হঠাৎ যেন থেমে যাবার মত হোল!

নিশীথ—নিশীথ—নিশীথ এসব কি বল্‌ছে? আমি একপাশে স'রে জড়সড় হ'য়ে বস্‌লুম। একবার নিশীথের পানে চেয়ে দেখলুম, তার নিষ্পলক দৃষ্টি আমার সারা দেহের উপর যেন অগ্নিবৃষ্টি ক'রে যাচ্ছে! সে আগুনের হল্‌কার নীচে আমার সমস্ত শরীর ছিট্‌ফিটিয়ে উঠ্‌ল! মনে হ'ল, খুব ক'রে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিই! কিন্তু তখন আমি কি বল্‌বো, কিছুই মনে এল না!

...হঠাৎ মনে পড়ল, আমি নিঃসহায়, একা...এই চলন্ত ট্রেণের কামরায় নিশীথের সঙ্গে আমি একা! সমস্ত শরীর আমার হিম হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

...নিশীথ হঠাৎ ধপ ক'রে আমার পায়ের কাছে ব'সে পড়ে দুহাতে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

আমার মাথার ভিতরটা যেন ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করেছিল। ব্যাপার কিছুই না বুঝে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লুম—ওকি, কাঁদছ কেন! কি হয়েছে তোমার ঠাকুরপো? খুলে বল আমায়! বল্‌বে না?

নিশীথ ছেলেমানুষের মত তেমনি কাঁদ্‌তে কাঁদতেই বল্‌লে—না

উমা, ও ডাকে আর আমার অধিকার নেই! অনেক—অনেক দিন আগে থেকেই আমি ও ডাকের মর্য্যাদা নষ্ট করিছি! ঠিক কবে থেকে এ পাপ আমার মনে গজিয়ে উঠলো তা আমি নিজেও জানি না, কিন্তু আজ বুঝচি কী সর্ব্বনাশই আমি করিচি!...উমা! উমা!

আবার আমার সারা দেহে উল্কা বৃষ্টি আরম্ভ হোল! লজ্জায়, ভয়ে গুটিসুটি মেরে আমার মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হ'তে লাগ্‌ল।

নিশীথ কতকটা প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বল্লে—না, তুমি অমন ক'রে ভয় পেয়ো না। তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ!...কিন্তু—কিন্তু পাগল হ'য়ে আমি এক ভয়ানক কাজ ক'রে ফেলেচি যে!

...ভয়ানক কাজ? কি ভয়ানক কাজ?...বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে ঐ কথাটা বেরিয়ে যেতে নিশীথ ব'লে উঠ্‌ল—সকলে জানে, আমরা পুরী যাচ্ছি, কিন্তু এ গাড়ী পুরী যাচ্ছে না, এখানা রাঁচী এক্সপ্রেস।

কী ভয়ঙ্কর! এ গাড়ী পুরীর নয়? সর্ব্বনাশ! আমি একবার বিস্ময়ে ভয়ে সোজা উঠে দাঁড়ালুম, পরক্ষণেই প্রবল হতাশায় ব'সে পড়তে হ'ল।...চোখের জল তখন বাঁধ ভেঙ্গে হু-হু ক'রে ছুটে আস্‌তে লাগ্‌ল।

প্রভাতের কথা

উঃ বড্ড আশা করেছিলুম এই টাইফয়েডের কেশটাকে নিশ্চয় খাড়া করে তুলবো! মস্ত বড়লোকের আদরের ছেলে, কল্‌কাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু বিধাতার মার, দুদিনের বেশী আর থাক্‌তে হ'ল না! সত্যিই, ছেলেটা মারা যেতে প্রাণে যেমন লেগেছে, রোগী মর্‌লে ডাক্তারদের প্রাণে তেমন লাগে না!

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত রকমে আমায় বাড়ী ফিরতে দেখে কিরণ বল্‌লে—ব্যাপার কি? তুমি যে আজই ফিরে এলে? এই বলে গেলে, অন্ততঃ সাত আট দিনের আগে তো ফিরতেই পারবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম—কি করব বল! রুগী টিক্‌লো না, কাজেই ডাক্তারেরও অন্ন উঠলো।

স্বামী দুদিন বাড়ী ছাড়া, কিরণ তাড়াতাড়ি কি ক'রে যে আমার সুখ সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে দেবে, তারই জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। আমি

হাস্‌তে হাস্‌তে তার হাত দুটো ধ'রে সামনের চেয়ারখানায় বসিয়ে দিয়ে বললুম—কিছু আমার চাইনে, তুমি এইখানটীতে বসো দেখি!

সলজ্জ হাসি হেসে কিরণ বল্‌লে—আচ্ছা, রঙ্গ পরে ক'রো। মুখ-চোখ একেবারে শুকিয়ে গেছে, দাঁড়াও, মুখ হাত ধোবার জল ঠিক ক'রে দিই; জলখাবার, চা—

আমি অস্থির হ'য়ে বললুম—বাপরে বাপ! মুখ হাত ধোবার জল ঠিক করবার জন্যে বাড়ীতে কি একটা চাকর পর্য্যন্ত নেই! না, এই ক'দিনে বামুন-চাকর-চাকরাণী সব বিদেয় ক'রে দিয়ে নিজেই সমস্ত চার্জ নিয়েছ?...সত্যি বল্‌চি, দুষ্টুমি করো না, ব'সো।

অগত্যা কিরণ ব'সে রইল। আমি মুখ হাত ধুয়ে এসে বললুম—দেখ্‌লে, মুখ ধোবার জল দেওয়ার জন্যে পাটরাণী কিরণবালার দরকার হয় না। কিরণের কাজ বুকের মাঝখানে কিরণ বিতরণ করা—ব'লে তার চিবুকটি তুলে ধ'রে গালের ওপর একটী চুম্বন উপহার দিলুম।

কথায় কথায় হঠাৎ শচীর কথা মনে পড়্‌তে কিরণকে জিজ্ঞাসা করলুম—হ্যাঁ, শচীর কাছ থেকে চিঠি এসেছে কিছু?

কিরণ বল্‌লে—এসেছিল, উমার নামে। তা, সে তো আজ এই ঘণ্টাখানেক আগে চ'লে গেছে।

—কোথায়?

—পুরীতে। শচীবাবু ভারী কাকুতি ক'রে চিঠি লিখেছিলেন, প'ড়ে তার কি কান্না, দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়! শেষে বল্লে, হয় আমায় পাঠিয়ে দাও, নয় তো এইখানে আমি উপোস ক'রে মরব!...কাজেই পাঠিয়ে দিতে হ'ল। ঠাকুরপো সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।

আমি স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলুম। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলুম, এখন সে কেমন আছে সে কথা কিছু লিখেছে?

—হ্যাঁ। ভাল তো কিছুই নয়, বরং খারাপই।

মনটা কেমন বিগ্‌ড়ে গেল। বল্‌লুম, তার বৌকে যেতে দেওয়া কিন্তু তোমাদের উচিত হয় নি!

কিরণ বল্লে—বা গো! ঐ সব দেখে শুনে বুঝি থাকা যায়? আমরা কি কম বোঝাতে চেষ্টা করেছি?

আমি কি বল্‌বো কোন জবাব খুঁজে পেলুম না।

কিরণ বল্‌লে—তা অন্যায়ই বা কি ক'রে বল্‌বো! দুজনের এত টান, পারে কি ছেড়ে থাকতে?...এই তুমি তো মোটে দু'দিন না দেখেই বৌটীকে আর ঘরের বাইরে যেতে দিচ্ছ না।

অতি দুঃখের মাঝেও তার এই ছেলেমানুষী কথা শুনে হাসি এল।—

—তুমি পাগল, তাই একথা বলছ, অবস্থা-ভেদে স্বর্গের সুধাও যে বিষ হয়ে পড়ে!...তা থাক্, দেখ তো ঘড়িটায় কটা বা'জল!

কিরণ ঘড়ি দেখে বল্লে, সাড়ে আটটা। কেন?

আমি বললুম—তা'হলে আমিও যাই, সঙ্গে ক'রে একেবারে নিয়ে আসি এইখানে! এই তিন চার মাসে উপকারই যখন কিছু হোল না—

কিরণ বল্লে—তা আজই যেতে হবে?

—তাই ভাবছি! পুরী এক্সপ্রেস পাবো না, পেসেঞ্জারটায় যেতে পারি।

কিরণ ঘাড় নেড়ে ঘোর আপত্তি জানিয়ে বল্‌লে—পাগল নাকি! আজই ফিরে এসে আজই নাকি আবার যাওয়া হয়!...আজ কিছুতেই যাওয়া হবে না, দরকার বোঝ বরং কাল যেও।

আমার কিন্তু যেন কেমন অশ্বস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌ল।

কিরণকে বললুম—তুমি তো জানো না, আমি ওদের চিনেছি, ওরা দুটীতেই সমান! সেখানে গিয়ে এ তার বুকে মাথা রেখে কাঁদ্‌বে, সেও একে বুকে চেপে ধরে কাঁদবে। এই দুর্ব্বল শরীরে ঐ কান্নাকাটি উত্তেজনা কি বেশী সহ্য হয়?—তার চেয়ে যাই; নিয়ে আসি কলকাতাতেই। উপস্থিত আমাদের ঐ ছোট বাড়ীটাতেই থাক্‌বে; তবু আমি দু'বেলা গিয়ে খোঁজ নিতে পারবো। কি বল?

—তা বেশ ত! কাল পরশু যেদিন হোক্ যেও।

—পরশু আর নয়, কালই।

—আচ্ছা গো আচ্ছা,—না হয় কালই।—বাবা! এমনি জেদী মানুষ তুমি!

আমি হাসবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু হাসি এল না। বললুম—কি কর্‌বো বল! ঐ হতভাগাটার কথা আমার যখনই মনে হয়, তখনই যেন আমার বুকের আগাগোড়া ব্যথার চাপে ভেঙ্গে আসে। দেখ্‌বার শোন্‌বার ওর আর কেউ নেই, ওর যত-কিছু ভরসা আমারই ওপর!...অথচ, উন্মত্ত হ'য়ে সে এখন যে সর্ব্বনাশ টেনে এনেছে, আমি যে কি ক'রে সে সর্ব্বনাশকে ঠেকিয়ে রাখি, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না।...ওঃ! বিয়ের আগে যদি একবার আমি ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারতুম, তা'হলে কি আর এ ব্যাপার ঘট্‌তে দিতুম!

কিরণ বল্লে—কি কর্‌তে ?

—জোর ক'রে এ বিয়ে ভেঙ্গে দিতুম, তাতে যা হয় হোত।...এখন আমার কি মনে হয় জানো ? শচীর কথা ছেড়েই দাও, তার নিজের অবিবেচনার ফল সে তো ভোগ করবেই, আমি তো এটাকে তার আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই বলিনে !—কিন্তু ঐ বউটা, এই ওকেও সে যে হত্যা করতে বসেছে, তার কি উপায় হবে বল দেখি !

কিরণ বল্লে—থাক্ বাপু, ওসব আর এখন থেকে মনে ক'রে কাজ নেই। ভগবানের মনে যদি তাই থাকে, তাহলে মানুষের আর হাত কি ?...আর, এ তো ওরই একার নয় ! সংসারে ওর চেয়েও যে কত ছোট ছোট মেয়ে—

—কি ! বৈধব্য নিয়েই জীবন কাটাচ্ছে ?...তা কাটাচ্ছে ! কিন্তু কথাটা শুন্‌তে বা বল্‌তে যত সহজ, আসল ব্যাপার তত সহজ নয় তো ! যদি একবার এই সমস্ত অসংখ্য বিধবার হৃদয়ের পরিচয় সংগ্রহ করতে বসা যায়, তা'হলে দেখ্‌বে কিরণ, আমাদের সমাজের বুকের ওপর দিনের-পর-দিন কত জলজ্যান্ত মানুষকে বলি দেওয়া হচ্ছে !

—তোমার সব আলাদা বিধান ! তুমি এখনই বলবে, বিধবাদের বিয়ে দেওয়া উচিত !

—তা তো বলবোই !...কিরণ ! সংসারে সব মেয়েই যে স্বামী হারিয়ে দেবী হয়ে বসবে, এ আশা যাঁরা করেন, তাঁদের আমি পাগল বলি ! অবশ্য, আদর্শ হিসাবে এর বড় আদর্শ আর নেই ! কিন্তু সব মেয়েকেই যে এই আদর্শের অনুরূপ হতে হবে, এবং তাই হবার জন্য

তার ওপর অতি নির্ম্মম বিধানের পর বিধান চাপিয়ে দিতে হবে, এই নিষ্ঠুর নীতিটাকে সমর্থন করতে আমি কোনদিনই পারি নি, পারবোও না কোনোদিন!

কিরণ অতিষ্ঠ হয়ে ব'লে উঠ্‌ল—আচ্ছা তুমি এখন ওঠ, খাবে চল! এ সব কথা একবার তোমার মাথায় চাপ্‌লে তোমার খিদে তেষ্টা থাকে না!

কথাটা মিথ্যা নয়! আমার মাথার ভিতর ঐ সমস্যাটা নিয়ে রাশি-রাশি যুক্তি এমনি তালগোল পাকিয়ে উঠছিল যে, এখানে নিবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে সহজ নয়! কিন্তু কিরণও নাছোড়বান্দা, আমি আবার কিছু বল্‌বার চেষ্টা করতেই সে ব'লে উঠ্‌ল—আবার? ওগো, মান্‌চি আমি সব কথা! ব'লে একমুখ হাস্‌তে হাস্‌তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।... ...

আমি একা চুপটি ক'রে বসে নিজের মাথার ভিতরই যুক্তির জাল বুন্‌তে লাগলুম।

*　　*

*

পরের দিনই পুরীর দিকে রওনা হওয়া গেল।

সেখানে যখন পৌঁছলুম, তখন সমুদ্রের বিশাল বুকের উপর তরুণ সূর্য্যের অবাধ নৃত্য চলেছে। প্রাণ যেন এক অপূর্ব্ব ভাবের উন্মাদনায় উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ল। এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন সংসারের সকল চিন্তা—সব বাধা-বন্ধন শিথিল হ'য়ে খ'সে পড়ে গেল।

কিন্তু সে ঐ মুহূর্ত্তের জন্যই! তবে ঐ মুহূর্ত্তের স্বপ্নেই এটুকু মনে করে হাসি এল, এই নিতান্ত নীরস কাঠ-খোট্টা মানুষ যে আমি, আমারও ভিতর কবিত্ব জিনিষটার অভাব নেই! 'মানুষমাত্রেই যে কবি' এ কথাটার সার্থকতা ঐ দিনই পুরোদস্তুর অনুভব করলুম।

...বরাবর সমুদ্রের ধারে ধারে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়ে দেখি, সামনের চাতালটির উপর একখানা ছোট আরাম-কেদারায় শচী। এই মাস দুই হ'ল তাকে দেখিনি, হঠাৎ তার চেহারা দেখে চ'ম্‌কে উঠলুম। ...ভগবান শচীকে যে মৃত্যুর দুয়ার পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে এসেছে!...শচী একা, উমা বোধ হয় বাড়ীর ভেতরে কোন কাজ করছে!

আমি কাছে এসে ডাকলুম—শচী!

সে তার কোঠরগত অথচ অতিমাত্রায় উজ্জ্বল চোখদুটো আমার পানে ফিরিয়েই ধড়মড় ক'রে উঠে বসবার চেষ্টা করলে। আমি তার হাত ধরে ফেলে তাকে নিবৃত্ত হতে বললুম।...গা তার বেশ গরম! জলভরা চোখদুটো আমার মুখের উপর রেখে বল্‌লে—প্রভাত!... এসেছো ভাই?...ভাল আছ? বলেই সে হাঁপাতে লাগল।

তার কুশল সম্বন্ধে মামুলি প্রশ্নটা তখন আমার ঠোঁট পর্য্যন্ত এসে বেধে গেল। ও কথা ওকে জিজ্ঞাসা করেই বা লাভ কি? ওর শোচনীয় অবস্থা যে ওর ওই শীর্ণদেহে, মুখে, চোখে সুস্পষ্ট লেখা রয়েছে!

খানিক চুপ ক'রে থেকে বললুম—আমি তোমায় নিতে এসেছি শচী!

নিতে এসেছ?...একটা সুস্পষ্ট করুণ হাসির রেখা তার শুষ্ক ঠোঁট

দুখানা কুঞ্চিত ক'রে দিয়ে গেল। হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে আমার হাতের উপর রেখে বল্‌লে—তাই চল ভাই! এ আর আমার সহ্য হচ্ছে না! সেইখানেই তোমাদের কাছে মরব, সেই ভাল!

আমি বাধা দিয়ে বললুম—আচ্ছা, বকোনা, থামো।

সে কিন্তু মাথা নেড়ে ব'লে উঠ্‌ল—না, মিথ্যে বলিনি ভাই! দুদিন বাদেই যখন চিরদিনের জন্যে এ পৃথিবী ছাড়তে হবে, তখন আর কেন এমন করে আমায় নির্ব্বাসিত ক'রে রাখো?...বলে, একটু চুপ ক'রে থেকে আমার হাতটা নিয়ে ঘাঁট্‌তে ঘাঁট্‌তে বল্লে—একটা কথা বলি—

—কি, বল না?

—উমা...ভাই, আমার উমা কেমন আছে?... ...

—সে কি? এ কথার মানে কি? প্রকাশ্যে বললুম—এ কি বল্‌ছো? ঠাট্টা করছো বুঝি? বৌদি ত' এখানেই?

সে তার শূন্য দৃষ্টি নিয়ে নিষ্পলক ভাবে আমার পানে চেয়ে রইল। তার সে দৃষ্টি দেখে আমার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে উঠ্‌ল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে বল্‌লুম—কেন, নিশীথ যে তাকে নিয়ে পরশু রাত্রের ট্রেণে সেখান থেকে বেরিয়েছে!...এখনো পৌঁছোয় নি তারা?

দুখানা হাতে চেয়ারের দুপাশে ভর দিয়ে সে হঠাৎ উঠে বসল। দুটো কথা শুধু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল,—কার সঙ্গে?

—আমার ভাই, নিশীথ!...কি বল্‌চো শচী, তারা এসে পৌঁছোয় নি?

কাঠের মত শক্ত শীর্ণ শরীর তার দ্বিগুণ দৌর্ব্বল্যে আবার চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়ল। মাথাটাকে দুবার প্রবলভাবে ঝাঁকানি দিয়ে সে সামনের অনন্ত সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল।

তার কথার এবং মুখের ভাব দেখে একটা নিরতিশয় কুৎসিত আশঙ্কা অগ্নিশিখার মত বুকের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। প্রাণপণে তাকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে যেন কিছুতেই বাগ মান্‌তে চাইলে না। তারই জ্বালায় অস্থির হ'য়ে আমি শচীকে কোন কিছু না বলে' পাশ কাটিয়ে সেখান থেকে নেমে গিয়ে সমুদ্র সৈকতের দিকে চলে গেলুম। সেখানে হতাশ ভাবে ব'সে প'ড়ে ঐ সর্ব্বনাশা চিন্তার হাতে আত্মসমর্পণ করলুম। নিশীথ! নিশীথ! তাও কি অসম্ভব? সে কি এত নীচ হবে? কিন্তু এখনো তারা এসেই বা পৌছুল না কেন? পথে কোন বিপদ হ'ল না কি?—ট্রেণের কিছু গোলযোগ হ'লে সে কথা তো অনেক আগে শুন্‌তে পাওয়া যেত! তবে?—পথে উমার হঠাৎ কোন অসুখ করলো কি? আর তাই নিয়ে নিশীথ একা বিব্রত হয়ে পড়েছে? কিন্তু তাহ'লে এখানে না এসে আর কোথায় যাবে? কিন্তু সব আশঙ্কা—সব অনুমানকে ছাপিয়ে কি-জানি কেন ঐ সন্দেহের বিশ্রী কালো ছায়াটা প্রেতের মত আমার চোখের সাম্‌নে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি কিছুতেই তাকে প্রশ্রয় দোব না, সেও যেন কিছুতেই আমাকে রেহাই দেবে না প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেছে! মনের ভেতর থেকে কে বল্‌লে তুমি যতই একথা অবিশ্বাস করবার চেষ্টা কর না কেন, শচীর মনে সেই ধারণাই বদ্ধ মূল হ'য়ে গেছে! নিশীথ তরুণ যুবক, উমা তরুণী, বুকের মাঝে তাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সমুদ্র! তুমি মূর্খ! তাই অতবড় একটা জ্বলন্ত সত্যকে অবিশ্বাস ক'রে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছ!

হৃদয়ের ভেতর থেকে এই অশরীরী বাণী ক্রমাগত তার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আমার সারা দেহ মন যেন আড়ষ্ট ক'রে তুলতে লাগ্‌ল। মাথার ভিতরটা হঠাৎ অসহ্য রকম গরম বোধ হ'তে লাগ্‌ল। সমুদ্রের শীকর-সিক্ত ঠাণ্ডা বাতাস ঝড়ের বেগে আমার সারা দেহ স্নান করিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু বাতাস তো দূরের কথা, সমুদ্রের ঐ অতল জলরাশিরও বুঝি ভেতরের সে আগুন নেবাবার ক্ষমতা ছিল না। জোর ক'রে উঠে দাঁড়ালুম, মনে মনে বললুম—ব্যাপার যাই হোক, নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকলে তো চল্‌বে না, এখুনি ষ্টেশনে গিয়ে একবার খোঁজ-খবর নেওয়া একান্ত দরকার। পথে হাজার রকমের বিপদ, কে বলতে পারে, হঠাৎ এক অচিন্তানীয় বিপদের আবর্ত্তের মাঝে তারা পড়ে গেছে কি না।

শচীকে ব'লে ষ্টেশনের কাছে যাবো মনে ক'রে বাড়ীর দিকে আসছি, হঠাৎ কাছাকাছি এসেই আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস ক'রে উঠল। রুদ্ধশ্বাসে ছুট্‌লুম—ও কিসের কান্না ?

চাতালের ওপর উঠেই পাথর হ'য়ে গেলুম। শচীর জ্ঞাতি-ভাই বিপিন শচীর চেয়ারের কাছে ব'সে মুখ ঢেকে কাঁদ্‌ছে! আর শচী ? সে ভয়াবহ দৃশ্য আমি কখনো ভুলবো না!

খপ্‌ ক'রে তার হাতখানা তুলে নাড়ী দেখ্‌বার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তার প্রয়োজন হ'ল না। শচী সকল যন্ত্রণা—সকল দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে! চোখদুটো তার ঠিক তেমনি শূন্যপ্রেক্ষণে চেয়ে আছে—সেই অনন্তের দিকেই !

না, কাঁদবো না, ছেলেমানুষের মত কেঁদে কি করবো! জুড়িয়েছে,

শচী জুড়িয়েছে! প্রাণপণ শক্তি দিয়ে বুকের আকুল কান্নাকে টেনে রেখে আমি তার উন্মিলীত বীভৎস চোখদুটোকে জোর ক'রে চেপে দিলুম।

বিপিন ব'লে উঠ্‌ল—কি হ'ল ডাক্তারবাবু?'

একথার উত্তর ছিল না। সব কথা—সব চিন্তাকে দমিয়ে দিয়ে এই একটা নিষ্ঠুর সত্য আমার বুকের নীচে অনবরত কশাঘাত করতে লাগল, তাহ'লে ঐ উমা আর নিশীথের সংবাদই শচীকে মেরে ফেল্‌লে! এ ছেড়ে আর অপর কোন কথা আমার মনে এল না, অপর কিছু ভাব্‌বার সামর্থ্যও আমার ছিল না!

অনেকক্ষণ কেটে গেল। আমি মাথা তুলে বিপিনকে বল্‌লুম—ওঠো বিপিন, যা হবার তাতো হয়েছে, এখন যাতে ওর শেষ কাজটা—আমার কথা অসমাপ্তই রয়ে গেল। বাহিরে কার যেন দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। বিপিনকে জিজ্ঞাসা করলুম—কেউ এল নাকি বিপিন?

শচীর আকস্মিক প্রস্থানের ধাক্কা সাম্‌লে উঠ্‌তে না উঠ্‌তে আবার এক প্রকাণ্ড ধাক্কা খেলুম।

বিপিন ভিতরে যাচ্ছিল। কিন্তু তার পূর্ব্বেই দরজা ঠেলে একটা দম্‌কা বাতাসের মত সেখানে প্রবেশ করলে উমা! এবং সাম্‌নে শচীকে দেখে দৌড়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি শচীর হাতখানা তুলে ধরে হঠাৎ সে যেন এক প্রবল বজ্রাঘাতে নিস্পন্দ হ'য়ে গেল; আমি বিপিনকে ইঙ্গিত করতেই সে এসে তাকে ধ'রে ফেলে ব'লে উঠ্‌ল—বৌদিদি! সব শেষ হ'য়ে গেছে!

উমা নির্ব্বাক হ'য়ে সেইখানে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়্ল, এবং একটু পরে হঠাৎ প্রবল আবেগে মৃত স্বামীর পা দুখানা টেনে নিয়ে বুকের উপর চেপে ধরে ব'লে উঠ্ল—পার্‌লে না—পার্‌লে না, আমার আশার জন্যে অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না? তার মুখের—মাথার কাপড় প্রবল ঝাঁকানিতে খ'সে পড়ে গেল।

সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সদ্য বিধবার সে আকুল কান্না তরঙ্গের ভীম গর্জ্জনকেও ছাপিয়ে উঠতে লাগল। কে জানে; ঐ দূরে—পরপারে দেবতার রাজ্যেও তার করুণ রেশটুকু গিয়ে পৌছুল কি না। কোন কথা—কোন সান্ত্বনার বাণী আমার মুখে এল না—শুধু একপাশে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

কাল সকালে যাদের এখানে এসে পৌছুবার কথা, কি কারণে তাদের পৌছুতে এত দেরী হ'য়ে গেল, সে কথা তখন সহজে মনে এল না, মনে এল অনেকক্ষণের পর। উমা তখন কেঁদে কেঁদে নির্জ্জীব হ'য়ে মরা স্বামীর পাশে উপুড় হ'য়ে পড়ে আছে। আমি আস্তে আস্তে ডাকলুম—বৌদি!

সে মাথা তুল্‌লে। এই প্রথম বোধ হয় সে আমাকে দেখতে পেয়ে কোন রকমে ধূলো-কাদা-মাখা আঁচলটুকু টেনে মাথায় তুলে দিলে।

আমি বললুম—আর অনর্থক দেরী করে লাভ নাই। বিপিন, আমি,—হ্যাঁ, আর নিশীথ আসেনি?

—সে বল্‌লে এসেছে, বোধ হয় বাইরে আছে।

আমি বাইরে এসে দেখি, দালানের একধারে নিশীথ একা চোরের মত চুপটী ক'রে বসে। তার এ ভাব দেখে আমার বেশ একটু চমক

লাগ্‌ল। মনে হোল জিজ্ঞাসা করি, কি হয়েছিল? ব্যাপার কি? কিন্তু বোধ করি অন্তর্য্যামী সব বুঝে-স্থঝে আমার মুখ চেপে ধরলেন।

আমি বললুম—নিশীথ! বিপিন কোথায় দেখেছ?

নিশীথের হঠাৎ যেন আপাদ মস্তক কেঁপে উঠ্‌ল। আমাকে এখানে দেখ্‌বার প্রত্যাশা সে করেনি, তা বুঝতে পারলুম। যেন, যেন অনেকখানি পাংশু হয়ে গিয়ে বল্লে—তা তো জানি না। বোধ হয় কোন কাজে গেছে।

আমার সেই কুৎসিত সন্দেহ প্রবলতরবেগে আমার হৃৎপিণ্ডের উপর ঘা বসিয়ে দিলে। কিন্তু এখন যে কথা নিয়ে তোলাপাড়া করবার ফুরসৎ মনকে দোব না বলেই আমি সেখান থেকে এসে যেখানে শচী আর উমা ছিল, সেইখানে গিয়ে দাড়ালুম। কিন্তু সে চিন্তা যে তখন আমায় পেয়ে বসেছে! তা'হলে উমা—উমা—না না বরং নিজের ভাইকে অবিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু উমা সম্বন্ধে সে কুৎসিত কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না। স্বামীর মৃত্যুতে তার শোণিতাভ তরুণ হৃদয়ের ছবি যে আমি স্থস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! সে কি কলঙ্কিনী হ'তে পারে?

কিন্তু কৌতূহল আর বেশীক্ষণ চেপে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল। বলে ফেললুম—রাস্তায় তোমাদের কোন বিপদ আপদ হয়েছিল না কি বৌঠান? সে গাড়ীতে—

উমা স্থিরদৃষ্টিতে মুখের পানে চাইলে। পরে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বল্‌লে না বিপদ নয়। বল্‌বো সব কথা, কিন্তু এখন নয়, তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরপো, এখন আর সে সব কথা জিজ্ঞাসা করো না।

তাহ'লে সন্দেহ একেবারে মিথ্যা নয়! বিপদ-আপদ নয় তো কি এমন ঘটেছিল যে—সমস্ত মন এক অনির্ব্বচনীয় বিতৃষ্ণায় তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। কাহিনী যাই হোক, সে সব শোন্‌বার প্রবৃত্তি আর আমার একবিন্দু রইল না।

শচীর দেহখানার ভস্মাবশিষ্ট বিশাল সাগরের অতল কোলে কোথায় তলিয়ে গেল! বাড়ী ফিরলুম যখন, তখন লোহিত সূর্য্য সমুদ্রের জলে ডুবে যাচ্ছে। আমি, বিপিন, আর আমাদের পিছনে একটু দূরে দূরে আসছিল নিশীথ। কারু মুখে একটা কথাও ছিল না—বাড়ীর কাছে এসে নিশীথকে না দেখে বিপিনকে জিজ্ঞাসা করলুম, নিশীথ কোথায় গেল?

বিপিনও বল্‌তে পারলে না। বল্লে—আমি একটু দেখে আসি। বলে, যে পথ দিয়ে আসছিলুম, আরও খানিকটা সেই পথে গেল। খানিকটা পরে ফিরে এসে বল্লে—তিনি কোথায় গেলেন? দেখতে পেলুম না ত?

একটা সন্দেহ হোল, কিন্তু ও কথা নিয়ে বেশী ভেবে দেখতে প্রবৃত্তি হোল না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—চুলোয় যাক্ গে, এস।

কিন্তু আশ্চর্য্য। অনেকক্ষণ কেটে গেল, রাত হোল, সে রাত্রি প্রভাতও হোল, কিন্তু ভায়ার আর দেখা পাওয়া গেল না।

সকালে—একটু বেলা হ'তে সমুদ্রের ধারে সেই চাতালের উপর গিয়ে দেখি, উমা এক দৃষ্টিতে সাগরের তরঙ্গ দেখ্‌ছে, পরণে থান কাপড়, রুক্ষ চুল, পিঠ বেয়ে পড়েছে। চোখ ফেটে জল এল। মনের ভেতর থেকে কে বলে উঠ্‌ল—শচী, ওপর থেকে দেখ একবার তোমার

অবিবেচনার ফল!—আর মনে হ'ল, মেয়েটার সেই পিশাচ কাকাটাকে যদি একবার এখন দেখ্‌তে পেতুম!

যাক্ সে কথা। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললুম—বৌদিদি—

সে আস্তে আস্তে মাথার উপর কাপড় তুলে দিলে। কি বল্‌ছ ঠাকুরপো? বসো—বলে একপাশে একটা বেতের মোড়া ছিল, উঠে গিয়ে সেটা এনে দিলে।

আমি বললুম—এইবার তো আমায় ফির্‌তে হবে।

সে নির্ব্বিকার ভাবে বল্‌লে—তা হবে বৈকি! আমি কোথায় যাবো?

—কোথায় যাবে বল?

সে বল্লে—একথা আমি কি বেশী জানি? তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন?

আমি বললুম—আমার বাড়ীতে যদি যেতে চাও ত চল।

সে যেন ক্ষণেক চুপ করে থেকে কি সব ভেবে নিলে। তারপর বল্লে—না, সেখানে আর যাবো না।

কে যেন আমার মনের ভিতর হ'তে বলে উঠ্‌ল—না-যেতে চাওয়ার কারণ, নিশীথ! মুখ ফুটে বললুম—তাহ'লে কোথায় যাবে বল?

সে বল্লে—ঘর-বাড়ী, বিষয়-আশয় আমার স্বামীর সবই আছে। আমি বর্দ্ধমানের বাড়ীতেই যাবো। বিপিন বলেছে, তার মা এখন দিনকতক যাতে আমার কাছে এসে থাকেন, তার ব্যবস্থা সে করে দেবে। আমায় তুমি সেইখানেই নিয়ে চল।

তাই ঠিক হোল যে, আমি উমাকে বর্দ্ধমানের বাড়ীতে রেখে আস্‌বো। ওদিকে বিপিন যত শীঘ্র সম্ভব তার মাকে নিয়ে সেখানে যাবে।

ভেবে দেখ্‌লুম, সেই ভাল তার পক্ষে। কেন না, শচীর গাঁয়ের বিষয়-আশয় ছাড়া বর্দ্ধমানে আরো দু তিন খানা ভাড়া বাড়ী আছে। সমস্ত সম্পত্তির আয় থেকে উমা একা খুব স্বচ্ছলভাবেই দিনপাত কর্‌তে পার্‌বে।

আমি সেখান থেকে চ'লে যাচ্ছিলুম, সে বল্লে—আর একটু ব'সো ঠাকুরপো; আর একটা কথা এখনো তোমায় বলা হয় নাই।

—কি কথা?

কাল তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে, বলেছিলুম পরে বল্‌বো। কিন্তু তুমি নিশ্চয় একটা-না-একটা কিছু ভেবে নিয়েছ! কি ভেবেছ তা জানি নে, কিন্তু আশা করি, তা স্বত্ত্বেও আমার কথা তুমি অবিশ্বাস করবে না।

আমি বললুম—অমন করে কেন বল্‌ছো বৌদি। বিশ্বাস না করবার কথা কি আছে?

সে স্থির স্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল—তা একটু আছে বৈকি ঠাকুরপো! কেন না, এটা মেয়েমানুষের মরণ-বাঁচনের কথা;—এখন তোমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করছে। শোন, নিশীথ আমাকে কল্‌কাতা থেকে এখানে আন্‌বার নাম করে রাঁচীর গাড়ীতে তুলেছিল। কিন্তু গাড়ীতেই সেই কথা সে আমায় স্পষ্ট খুলে বলে। আমি তখন কি যে করবো কিছুই বুঝতে পারলুম না, কেবল কাঁদতে লাগলুম। গাড়ী

রাঁচীতে এসে পড়ল। নিশীথের মনে যে খুব অনুতাপ হচ্ছিল, সে কথা আমি বুঝতে পারলুম ; আমি যখন বল্‌লুম, যেমন ক'রে পারো, আমাকে পুরী নিয়ে চল, তখন সে যেন কৃতার্থ হ'য়ে গেল।...ঠিক এই পর্য্যন্ত. এর বেশী আর কিছু না! তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, আর কিছু না।

সে হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত আমার পা দুখানা চেপে ধর্‌লে। আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম—ছি ছি, কি কর বৌদি! তুমি যা বল্‌ছ, তার এক বর্ণও অবিশ্বাস কচ্ছি না, করবোও না কোনদিন!

সে উঠে ব'সে আঁচলে চোখ মুছে বললে—আমি সব বুঝেছি। এও বুঝেছি যে কি গভীর সন্দেহের কালী নিয়ে স্বামী আমার এখান থেকে বিদায় নিয়েছেন! আর ঐ ভাবনা—ঐ খেদ মলেও আমার যাবে না ঠাকুরপো। আমি তাঁর এই সন্দেহটুকু ঘোচাবার অবসর পেলুম না!

চোখের জল তার দুটী গাল বেয়ে দর্ দর্ ক'রে গড়িয়ে পড়্‌তে লাগল।

উমার কথা

আবার সেই বাড়ী! এই বাড়ীই আমার সুখের স্বর্গ, এই বাড়ীই আমার সমাধি! এ জীবনের যতটুকু সুখ, যতটুকু আনন্দ ভগবান্ দয়া ক'রে আমার কপালে লিখেছিলেন, তা আমি এইখানেই পেয়েছি. আর এখন? এখন থেকে সেই শেষের দিনটী পর্য্যন্ত এইখানেই আমায় প'ড়ে থাকতে হবে, কৃপণের মত সেই ক্ষণিক সুখের স্মৃতিটুকু বুকের উপর জড়িয়ে ধ'রে! কিন্তু সে কতদিন—কত কাল?...দিনরাত কেবল তাই ভাব্‌ছি।

লোকে বলে, বিধবা হ'লে মেয়েমানুষের পরমায়ু নাকি বেড়ে যায়। আহা! তা আর যাবে না গা! তা নইলে দয়াময়ের দয়ার মাত্রা পূর্ণ হবে কেন?... ...

আমি একা—শুধু এ বাড়ীতে নয়, এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে আমি নিতান্তই একা! সংসারে এত লোক রয়েছে, এ বাড়ীতেও বিপিন,

বিপিনের মা রয়েছে, তবু আমি একা! এদের সঙ্গে যেন আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সম্বন্ধ থাকে, সে টুকুও বুঝি নেই! আমার নিজের বাড়ীতে আমি চির—নির্ব্বাসিত, পৃথিবীর বুকের মাঝে বাস ক'রেও যেন আমি কোন্ এক বিরাট অন্ধকার শূন্যরাজ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই, অথচ ঘোরার বিরামও নেই। বেঁচে আছি শুধু মরূতে পারছি না ব'লেই।

প্রভাতবাবু যাবার সময় ব'লে গেছেন, হামেসা কিরণ দিদির কাছে চিঠিপত্র লিখ্‌তে, এবং যখন যা অভাব অসুবিধা হবে, সেই চিঠির মারফত তাঁকে জানাতে। কিন্তু বিধবার জীবনে আবার অভাব কি? স্বামীর বিষয় সম্পত্তির যা' আয়, তা একটা বিধবার ভরণ-পোষণের পক্ষে যথেষ্ট'র চেয়েও ঢের বেশী, তবে আবার কিসের অভাব? অভাব, অসুবিধা, সুখ, দুঃখ সব তো সেই সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়ে চ'লে এসেছি।......

কিরণদিদি লিখেছিলেন, পড়াশুনো নিয়ে থাকবার চেষ্টা ক'রো বোন্,—মন তাতে ভাল থাকৃবে। দেখ্‌চি, কথাটা ঠিক্। তাই কিরণদিদিকে লিখেছিলুম, তিনি যেন ভাল ভাল বাংলা বই আমায় এখানে পাঠিয়ে দেন। এখন সঙ্গী বল্‌তে যদি কেউ আমার থাকে, ত' ওরাই। কলকাতার ভাল দু'তিনখানা মাসিক পত্র, তা ছাড়া আরও অনেক বই প্রায় সেখান থেকে কিরণদিদি পাঠিয়ে দেন। দামের কথা লিখেছিলুম, কিন্তু তাঁরা কোন গা-গোছ করেন নি। শেষে আমি একদিন বিপিনকে দিয়ে ৫০৲ টাকা তাঁর কাছে পাঠিয়ে

দিয়েছিলুম। তাতে কিরণদিদি লিখেছিলেন—"টাকার জন্যে অত ব্যস্ত না হ'লেও চল্‌ত। তা বেশ তুমি মাসের মাস ৫৲।১০৲টাকা যেমন পারো আমায় পাঠিয়ে দিও, আমি বই পাঠাবো।"

হয়ত' এই নিয়ে তাঁরা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কিন্তু, কেনই বা আমি ওদের কাছে ঋণী থাক্‌তে যাবো? স্বামীই যখন গেছেন, তখন আর তাঁদের সঙ্গে কিসের সম্বন্ধ? না না, ঠিক তা নয়! সে কথা বল্‌লে কৃতঘ্নতা হবে যে! তাঁরা আমাদের যা করেছেন—প্রভাত-বাবু, কিরণদিদি, মা, আর নিশীথ—

যাক্ সে কথা। দোষ-ঘাট নিশীথ যা'ই কিছু ক'রে থাক্, তবু তার ভেতর যেটুকু ভাল, সেটুকু স্বীকার কেন করবো না? দোষ তার যতখানি, অনুতাপ তার চেয়ে যে সে ঢের বেশী ভোগ করেছে, আর এখনো করছেও, এ কথা কেউ বুঝুক, আর না বুঝুক, আমি তো বুঝ্‌ছি!...

সেই পুরী থেকে সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে, আর কোন খোঁজ খবর নেই। তার এই স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসনের কারণ যে কী সে কথা আমি তো জানি।

তাই মাঝে-মাঝে মনে হয়, বিধাতার কাছ হ'তে অভিশাপের বোঝা আমি যে কেবল নিজে ঘাড়ে ক'রেই এনেছি, তা নয়, যে আমার সংস্পর্শে এসেছে, তাকেই আমি জালিয়ে পুড়িয়ে-খাক করেছি। নইলে নিশীথেরই বা আজ এ দুর্গতি হবে কেন? শুধু আমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল বলেই ত?

কিন্তু যখনই ঐ নিশীথের কথা মনে পড়ে, তখনই কে যেন

আর্ত্তকরুণ স্বরে বুকের ভেতর থেকে ব'লে ওঠে, শুধু তারই জন্যে—তারই দোষে স্বামীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হ'তে পায় নি!—কত যে চেষ্টা করি কিছুতেই ও কথাকে মনে স্থান দোব না, কিন্তু পারি না।

মনে মনে বলি, আমার কপালে যা ছিল, তার জন্যে তাকে দায়ী ক'রে লাভ কি? হতভাগী আমিই। এর জন্যে কেউ দায়ী নয়, কেউ দোষী নয়।

না, নিশীথের সেই একটা ভুল—সেই একটা অপরাধ—আমি মন থেকে মুছে ফেল্‌ব—তাকে আমি ক্ষমা করব। এই ব'লেই আমি মনকে বোঝাব।—অপরাধ তার যাই হোক্, এই কঠোর অনুতাপে তার প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে গেছে।......

আকাশ জুড়ে আজ রাশি রাশি কালো মেঘ জমেছে; সারা আকাশ যেন থম্ থম্ করছে!

রান্না-খাওয়া শেষ ক'রে বুকের ওপর নূতন একখানা বই নিয়ে পড়্‌ছি, আর আকাশের পানে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখ্‌ছি। উপন্যাসের কাল্পনিক ঘটনা কিছুতেই যেন মনের ভেতর জমতে পারছে না, হৃদয় যেন সব ছেড়ে কত দূর-দূরান্তরে দিশেহারা হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!......

এমনি মেঘ্‌লা দিনে তিনি এই ঘরে ছেলেমানুষটীর মত আমার কোলের উপর মাথাটি গুঁজে কত কথাই ব'লে যেতেন! তখন আমার বুকের মধ্যে কত আশা—কত রাশি রাশি বাসনা ঐ মানুষটীকে জড়িয়ে ধ'রে সার্থক হ'তে চেয়েছিল! সেদিন যে সোনার স্বপ্ন দেখেছিলুম, তার মাঝে একবারও তো আজ্‌কের আমার এই

মূর্ত্তি কল্পনাতেও আসে নি! একবারও তো মনে হয় নি, বছর ঘুরতে না ঘুরতে সেই সব কথা—সেই সব স্মৃতিই আমার সারা জীবনের একমাত্র সম্বল হ'য়ে দাঁড়াবে! কেমন করেই বা মনে হবে! তখন তো জান্‌তুম না।

না, ঘুণাক্ষরেও কিছুই জানতুম না তখন। কিন্তু তিনি ত' জানতেন! এখন বেশ বুঝ্‌তে পারি, ঐ ব্যারামের কথাটা আমার কাছ থেকে চেপে রাখবার জন্যে তিনি কত সাবধান হ'য়েই না চল্‌তেন!...

অনেককে বল্‌তে শুনেছি, বিয়ে না কর্‌লে তিনি হয়ত' আরো কিছুদিন বাঁচতেন। তাই যদি সত্যি হয়, তাহ'লে কেন তিনি এত বড় মারাত্মক ভুল করতে গেলেন?—আমার লোভে? ছাই! এমন কি আমার ভেতর আছে? তবে আমার ওপর দয়া ক'রে? অত বয়েস পর্য্যন্ত থুবড়ো ছিলুম, তাই? কিন্তু কেন? কি দরকার ছিল তাঁর? না-হয় সেই অবস্থাতেই কাকীর কাছে জ্বালা যন্ত্রণা খেতে খেতে একদিন আমার মরণ হোত, তাতেই বা কি ক্ষতি ছিল? মরতুম আমি একাই, সংসারের কাউকে তো তার জন্যে কাঁদতে হোত' না। আমার অভাবে আর কোন প্রাণী ত অনাথ হোত' না। এর চেয়ে সে যে ঢের ভাল—লক্ষ গুণে ভাল ছিল। আমার জন্যে নিজে কেন জেনে-শুনে তিনি এমন করে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন।

...পুরুষ আর নারীর জীবনে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। পুরুষই আসল মানুষ, আমরা তার ছায়া বই তা'র কিছুই নই! কিন্তু একটা খটকা লাগে। আসল জিনিসটি চ'লে গেলে ছায়াও যেমন তার সঙ্গে

সঙ্গে মিলিয়ে যায়, কৈ পুরুষ চলে গেলে নারীও তো সঙ্গে সঙ্গে মরতে পারে না! অনেকে হয়ত বলবে বৈধব্যই নারীর মরণ! তা অনেকটা সত্যি হলেও তবু একে ত' ঠিক মরণ বলতে পারি না। তা যদি হোত, তা'হলে আবার এত কথা মনে হয় কেন? মনে হয় কেন যে, স্বামীকে হারিয়ে আমার এত কষ্ট, স্বামী বেঁচে থাকলে কত সুখে আমি থাকতুম? তা যদি হোত, তাহ'লে দিবারাত্রি কেন এই আকুল হতাশ্বাস, এই মর্ম্মবেদন, এই ব্যর্থ জীবনের দুরন্ত জ্বালা। মরার প্রাণে আবার যন্ত্রণা কিসের? এত পাগল করা চিন্তা কিসের? এ যদি মরণই, তবে ভগবান এদের হাত থেকে বিধবাদের নিষ্কৃতি দেন না কেন? এ টুকু কার্পণ্য তাঁর কেন?

কিন্তু ঠিক তা তো নয়! এ তো ভগবানের বিধান নয়, এ বিধান সমাজের—হিন্দু সমাজের! কেন না, অনেক বইয়েতে দেখেছি, মুসলমান, খৃষ্টান সমাজের মেয়েরা বিধবা হ'লেও আবার বিবাহ কর্ত্তে পায়। নিশীথও একদিন কথায় কথায় এই কথাই ব'লেছিল, আর বলেছিল, বিধবাদের বিয়ে দেবার জন্যে আমাদের দেশেরও অনেক লোক উঠে পড়ে' লেগেছেন, কিন্তু এখানে সে কাজ সফল হ'তে পাচ্ছে না। কিরণদিদি নিশীথের কথায় বলেছিলেন, এদেশে ওসব কাজ সফল হবেও না কোনদিন, তা যত চেষ্টাই কেন হোক্ না! নিশীথ বলেছিল, সফল যদি না হয়, সেটা আমাদের দোষ বই গুণ নয়।

কিরণদিদি কিম্বা নিশীথ, কার কথা ঠিক, সে সব মীমাংসা করবার সাধ্য আমার নেই। বোধ হয়, কিরণদিদি যা' বলেছিলেন, তাই সত্যি। হিন্দুর মেয়ের ইহকালে এবং পরকালে, জীবনে এবং মরণে

স্বামীই একমাত্র ধ্যান, গতি, লক্ষ্য! এত বড় আদর্শ কাদের জাতে আছে?

কিন্তু একটা কথা আমি না মনে ক'রে থাক্‌তে পারি নে। আগেকার সমাজে বিধবা হ'লে মেয়েদের সব গড়া স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় পুড়িয়ে ফেলা হ'ত। শুন্‌তে সেটা যতই নিষ্ঠুর মনে হোক্‌, এখনকার দিনের এই তিলে-তিলে পুড়ে মরার চেয়ে সে প্রথা কি ঢের ভাল—ঢের বাঞ্ছনীয় ছিল না?

যাক ওসব কথা। ওসব ছাই-ভস্ম ভেবে লাভও কিছু নেই, কেবল নিজের মাথার ভিতর আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া! মাসিক কাগজ-গুলোতে প্রায়ই ঐ সব নিয়ে কথা-কাটাকাটি চলেছে দেখ্‌তে পাই, তাই নিয়ে একদল অন্য দলকে গালিগালাজও কত দিচ্ছে। প্রথম প্রথম ঐ সব বাদ-প্রতিবাদ গুলো পড়্‌তে বড্ড ভালো লাগ্‌তো, কিন্তু আর পড়ি না। কেননা দেখেছি, ওদের ভেতর কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন পাপের বিষ আছে, যাকে মনের ভেতর ঢুকতে দেওয়া ভারী খারাপ! এক-একদিন ঐ সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে প্রাণের ভেতরটা এমনি তোলপাড় ক'রে উঠ্‌তো যে, কিছুতেই যেন তাকে আর বশে আন্‌তে পার্‌তুম না। তাই ওসব প্রবন্ধ দেখলেই আমি সে সব পাতাগুলো উল্টে চ'লে যাই। হিন্দুর ঘরের মেয়ে আমি, হিন্দুর বিধবা, ওসব পাপ-নীতি মনে তোলাপাড়া করাও পাপ!

তাই, যখনই ঐ সব জটীল প্রশ্ন মনের ভেতর ঠেলে ওঠবার সূচনা করে, তখনি আমি আমার স্বামীর কথা—তাঁরই মধুর স্মৃতিগুলি

ধ্যান ক'রে ও কুৎসিত গ্লানি কাটিয়ে মনকে তার পূজার অনুরূপ নির্ম্মাণ ক'রে তোল্‌বার চেষ্টা করি!

কিন্তু ঐ বইগুলি—ওদের আমি একেবারে ছাড়্‌তেও তো পারি না, বোধ হয় যতদিন বাঁচবো, ততদিন তা পারবোও না। বিপিনের মা তার জন্যে যে আমার ওপর কত বিরক্ত তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি। সেদিন স্পষ্টই বলেছিলেন, রাতদিন ঐ সব ছাইভস্মগুলো নিয়ে কি যে প'ড়ে আছ বৌমা!—ভালোও লাগে?

আমার কিন্তু ও সব কথা সহ্য হয় না। বলেছিলুম,—তা মন্দ কি, একটা নিয়ে ত' থাকতে হবে!

বিপিনের মার দরদ যে কোন্‌খানে, তা সেদিন বুঝতে পারি নি, পারলুম তার ক'দিন পরেই।... ...

নীচেয় বিপিনকে দাঁড়িয়ে তিনি বল্‌ছিলেন শুন্‌লুম, মাসের মাসে কতকগুলো ক'রে টাকা ঐ সব ছাইভস্ম বই-খাতা কিনেই ওড়ানো হচ্ছে! এ কি যে মেয়ের ছিষ্টিছাড়া বাই, তাতো কিছু বুঝি নে। বারণ করতে পারিস্‌ নে তুই?

বিপিন বল্‌লে, বাঃ, আমি কি ক'রে বারণ কর্‌বো বল?...তার মা আর কিছু না বোলে গস্‌ গস্‌ কর্‌তে কর্‌তে চলে গেল।

আমার এমনি রাগ হোল! এতেও ওদের চোখ টাটায়! আমার স্বামীর পয়সা আমি খরচ করব, তাতে ওরা বল্‌বার কে?... ...

মনে ঠিক করলুম, এবার থেকে আরও বেশী করে বই আনতে পাঠাবো, দেখি, ওরা কি করতে পারে।

কিসের জন্যেই বা এসব কথা ওঠে, তা তো আমি বুঝতে পারিনে!

আমার যা-কিছু বিষয়-আশয়, সে সমস্তই আজকাল বিপিন দেখাশুনা করে, টাকাকড়ির দেওয়া-নেওয়া, হিসেব-কিতেব, সবই এখন তারই হাতে। কিন্তু তেমনি আমি তো তোদের কোনো অভাবই রাখি নি! ওদেরও যখন যা' দরকার সব তো ঐ পয়সা থেকেই হচ্ছে! তা' সত্ত্বেও আমার টাকা আমি খরচা করতে চাইলে ওদের এ গায়ের জ্বালা হয় কেন? এ কি নীচ মন ওদের তা কিছু বুঝতে পারি নে!

সংসারে টাকাটা যে কত বড় জিনিষ, তা শুধু এঁদের ব্যবহারে নয়, আমার নিজের কাকা-কাকীর ব্যবহারেও বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। আমি বিধবা হয়েছি এবং স্বামীর বিষয়-আশয়ের আয়ও নিতান্ত কম নয়, সে কথা কাকার অজানা ছিল না। এখানে আস্‌বার দু'চার দিনের পরই কাকার কাছ থেকে একখানা চিঠি পাই। অনেক দুঃখ জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন—"তোমায় দেখবার শোনবার এখন তো আর কেউ নেই মা, তার জন্যে একটুও ভয় বা ভাবনা ক'রোনা। দু'তিন দিনের ভেতরই এখানকার যাহোক্ একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তোমার কাকীমা সেইখানে তোমার কাছেই থাক্‌বেন।" চিঠি প'ড়ে আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত জ্ব'লে গিয়েছিল। এখন তাঁদের মমতা উথ্‌লে উঠ্‌বে বৈ কি!

আমি একখানি চিঠিতে শুধু দুটো কথা লিখে দিলুম—এখানে আমার জেঠশাশুড়ি ও তাঁর ছেলে এসে আছেন, কাকীমার আস্‌বার কোন দরকার নেই। বোধ হয়, সেই চিঠি পেয়ে তাঁরা বড্ড মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে তাঁদের সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু নির্লজ্জতা তাঁদের যে কত বেশী তা আমি তখন ধারণাই করতে পারিনি! কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একদিন কাকীমা তাঁর ছোট

মেয়ে মীনুকে নিয়ে আমার এখানে এসে হাজির! এসেই আমাকে দেখে তো একবারে ডাকছেড়ে কেঁদে উঠলেন। আমার কপাল পোড়বার সে প্রায় পাঁচ-ছ' মাস পরে। কাকীর ব্যাপার দেখে আমি কাঠ হ'য়ে গেলুম। প্রাণে যার দুঃখ-শোকের একবিন্দু নেই, সে এত সহজে এমন কান্নাটা কেমন ক'রে কাঁদতে পারে, আমি তো তা ধারণাই করতে পারিনে! মীনুর বয়েস বছর ১২।১৩; সে হতভম্বের মত একপাশে দাঁড়িয়েছিল। আমি তার হাত ধ'রে বল্লুম, আয় মীনু, ওপরে আয়। বলে, বিপিনের মা কিম্বা আমার নবাগতা কাকীমাকে কোন কিছু না ব'লে মীনুকে সঙ্গে ক'রে ওপরে চ'লে গেলুম।

ওপর থেকেই শুনতে পেলুম, কাকীর কান্নার সুর ক্রমশঃ কমে আসতে-আসতে একেবারে থেমে গেল। আমিও যেন বাঁচলুম। ওই লোক-দেখানো কান্না আমার বুকের ওপর যেন একখানা ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়ে আমার নিশ্বাস আটকে দিচ্ছিল।

মীনুকে অনেকগুলো ছবির বই বার ক'রে দিলুম; সে ছবি দেখতে লাগল। আমি তার কাছে ব'সে রইলুম, অথচ, নীচে গিয়ে কাকীর সঙ্গে দু'টো কথাবার্ত্তা কইব, সে প্রবৃত্তিও হোল না।

অনেকক্ষণ পরে বিপিনের মা কাকীকে সঙ্গে ক'রে উপরে উঠে এল। বিপিনের মা বল্লে, বেয়ান অনেক ক'রে বলচে বৌমা, তাই না-হয় দিনকতক ঘুরেই এস ওঁদের কাছ থেকে। তবু দু'দিন নতুন জায়গায় থাকলে মনটা একটু সুস্থির হ'তে পারবে। আর তোমার বোনের বিয়েও তো শীগগীর হচ্ছে—ব'লে কাকীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কবে বল্লে বেয়ান, এই সামনের মাসেই বুঝি?

কাকী বল্‌লেন, হ্যাঁ, সবই ঠিক হয়ে গেছে শুধু দিনস্থির হ'তেই বাকী। তা কেবল আমার উমাটি গেলেই ত' চল্‌বে না দিদি! তোমাদেরও তো যাওয়া চাই?

কা'র বিয়ে? মীনুর? মুখ তুলে দেখ্‌লুম, মীনু হাতের বইখানার ওপর একেবারে ঝুঁকে প'ড়ে ছবি দেখ্‌চে। মুখখানি তার লাল্‌চে হ'য়ে উঠেছে।

বিপিনের মা বল্‌লে, তাহ'লে কবে যাওয়ার ঠিক হয়, বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর বেয়ান্, বিপিনকে ব'লে আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দোব। তারপর হঠাৎ রুদ্ধস্বরে আমার স্বামীর নাম ক'রে বল্‌লেন, আজ আমার সে নেই তাই, নইলে তোমার মেয়ের বিয়ে, এর চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে বল?

কাকী অমনি কান্নার সুরে আরম্ভ করলেন, আর দিদি, সে কথা আর ব'লোনা। যেদিন থেকে উমার আমার এই সর্ব্বনাশের কথা শুনিচি, সেদিন থেকে কি আর আমাতে আমি আছি বেয়ান?

আমার গা জ্বালা ক'রে উঠ্‌ল।

এত বড় মিথ্যা কথাও মানুষ এমন নির্ব্বিবাদে ব'লে যেতে পাবে? এ মিথ্যা কথা বলার উদ্দেশ্য কি? বার-বার 'আমার উমা' 'আমার উমা' ব'লে এত গভীর আত্মীয়তা দেখানোরই বা উদ্দেশ্য কি? জেনে শুনে যারা আমার এই সর্ব্বনাশ করেছে, আজও কি তাদের শত্রুতা করার সাধ মেটে নি? সেখানে নিয়ে গিয়ে আরও কিছু শত্রুতা করবার মৎলব আছে নাকি?

বিপিনের মা নীচেয় চ'লে যেতে কাকী বল্‌লে, তোমার কাকা

নিজেই আস্‌তেন মা, কিন্তু এমনি মানুষ, এতদিনের ভেতর কি একদিন একটু অবসর ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লেন না? তাই আমি বোল্‌লুম, তোমার সাতজন্মেও সময় হবে না। পাড়ার ঘোষালদের পটল যাচ্ছে বর্দ্ধমানে, আমি মীনুকে নিয়ে তার সঙ্গে গিয়ে তাকে একবার দেখে আসি।

এত কথার একটা উত্তরও কিন্তু আমার মুখ দিয়ে বেরুল না। কাকী একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, পরশু তো তেরোদশী, তা ঐ দিন আমার সঙ্গে চল না মা। তোমার দেওর বিপিন সঙ্গে ক'রে দিয়ে আসবে এখন।

আর চুপ ক'রে থাকা উচিত নয় ভেবে জোর ক'রে বলে ফেললুম,—আমার কি করে যাওয়া হবে? আমার গেলে কি চলে?

কাকী বল্লে,—কেন, তোমার সংসারের আর ঝঞ্ঝাট কি মা? বেয়ান ত' বল্লে—

আমার রাগ হ'তে লাগ্‌ল। বল্‌লুম,—ওঁরা বল্লে আর কি হবে কাকী! আমার এখন কিছুতেই যাওয়া হবে না।

আমার এই স্পষ্ট কথার ধাক্কা খেয়ে কাকী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। পরে আস্তে আস্তে বল্লে,—ও-মাসে মীনুর বিয়ে, তুমি না গেলে—

বাধা দিয়ে বল্‌লুম,—আমি বিধবা মানুষ, আমায় বিয়ের কাজের কোনো সম্পর্কে ত' থাক্‌তে নেই কাকী।

আর ও'সব কথা তুলোনা মা! পোড়া বিধাতা যে এমন করবেন—ব'লে কাকী আবার কান্নার সুর তুল্‌তে আমার মাথার ভেতর রাগে

রী-রী ক'রে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বিধাতার ওপর সব দোষ চাপালে চলে না কাকী! আমার এ পোড়া কপালের কথা তোমরা অনেক আগেই টের পেয়েছিলে। জেনেশুনেই তোমরা এটুকু ঘট্‌তে দিয়েছিলে, জেনেশুনেই তোমরা—

একসঙ্গে আরও রাশি রাশি শক্ত কথা আমার মুখ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠেছিল। আমি জোর ক'রে তাদের চেপে ধরলুম। হঠাৎ এইরকম বাধা পেয়ে কথাগুলো যেন আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত শিউরে তুল্‌তে লাগ্‌ল।

কাকীর মুখ পাঙ্গাস্‌ হয়ে গেল। বোধ হয় অনেক চেষ্টা ক'রে বিনিয়ে-বিনিয়ে আরও কিছু বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা দিয়ে আমি বললুম, মিছে আর আমায় পেড়াপীড়ি ক'রে লাভ নেই কাকী। আমার কথার নড়চড় করতে কেউ পারবে না। আমার বাপ-মা গেছেন, স্বামী গেছেন, এ সংসারে নিজের বলতে এখন কেউ নেই, এ বাড়ী ছেড়ে যাবার জায়গাও আমার কোথাও নেই।

কাকী বললে, তাহ'লে তুমি আমাদের পর ভাবছো?

আমার মাথায় তখন ভূত চেপেছিল। বললুম—সে কথা কি তোমরা আজ জানছ? আমি যে তোমাদের কেউ নই, সে কথা তো আমি তোমাদের কাছ থেকেই শিখেছি কাকী! যদি আপনার হ'তুম, আপনার মেয়েকে তোমরা কখনো চোখ চেয়ে কি এই বিষ খাওয়াতে পার্‌তে?

হঠাৎ জোর ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চুপ ক'রে গেলুম।...বলতে যাচ্ছিলুম, এই মীনু তোমার পেটের মেয়ে, তাকে যা'র হাতে তুলে দিতে যাচ্ছ, তার সম্বন্ধে যদি কিছু কাণে আসে তোমাদের—কিন্তু

ছি ছি, ভাগিস কথাটা বলিনি ! ঐ রাক্ষসী কাকীকে যেন কিছুই বলতে আজ আর আমার মুখে বাধে না, কিন্তু মীনু যে সামনে বসে ; সেয়ানা মেয়ে—তার সম্বন্ধে এ ভীষণ কথা—

না, মীনু বেশ লক্ষ্মী মেয়ে ! আজ-বাদে-কাল ও স্বামীর ঘরে যাবে, ভগবান্ করুন, ওর সিঁথের সিঁদুর, হাতের নোয়া চিরকাল অক্ষয় হ'য়ে থাক্। আমার গায়ের বাতাস যেন অতি-বড় শত্রুর গায়েও না লাগে ! ভগবান্, মীনুকে আমি কিছু বলি নি, আমার যত রাগ তার বাপ-মায়ের ওপর, তার ওপর নয়।... ...

নিজের বুকের এই অসহ্য জ্বালা চেপে রাখাও যেন আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে এল। পাছে আরও কতকগুলো এর-চেয়েও শক্ত কথা ব'লে ফেলি, সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে অন্য ঘরে গিয়ে চুপ ক'রে উপুড় হ'য়ে শুয়ে রইলুম।

কতক্ষণ সেইখানে সেই অবস্থায় পড়েছিলুম, জানি নে ; বিপিনের মায়ের গলার স্বরে আমার চমক্ ভাঙ্গল। বিপিনের মা গালে হাত দিয়ে বললেন, বলি হ্যাগা বউমা, এসব রকম কি তোমার ? নিজের কাকীমা বাড়ীতে এল, তা' তাকে না ব'স্তে বলা, না খেতে বলা ; উল্টে তা কে কি সব ছাই-ভস্ম বল্লে যে, চোখের জল ফেল্তে ফেল্তে তারা বাড়ী থেকে চলে গেল। এত ক'রে বল্লুম দুটো মুখে দিতে, তা কিছুতেই হাতে-মুখে করলে না ! আমি শেষে জোর ক'রে মেয়েটাকে খাইয়ে দিই ! এসবকে কি বলে ?

আমি কাঠ হ'য়ে প'ড়ে রইলুম। তারা চ'লে গিয়েছে ? আঃ ! প্রাণে তবু যেন একটু বাতাস লাগ্ল !

বিপিনের মা বল্লে,—জানিনে বাছা, কি তোমার মন! এ তো আমি কখনো সাতজন্মে দেখিনি! দিনরাত ঐ ছাই-ভস্ম বইগুলো প'ড়ে প'ড়ে তোমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেল দেখ্‌চি!

তবু আমি কোন উত্তর দিলুম না। বিপিনের মা নিজেরই মনে আরো খানিকটা তিরস্কার ক'রে শেষে বিরক্ত হ'য়ে নীচে চ'লে গেল।

কথাটা কিন্তু আমার মন থেকে যেন কিছুতেই সর্‌তে চাইলে না। আমার নিজের বুকের ভেতর থেকেও যেন কে বল্‌তে লাগ্‌ল, কেনই বা অত কথা আমার বল্‌তে যাওয়া! শুধু বল্‌লেই তো হ'ত যে, আমি যেতে পারবো না। আমার ওপর যে অবিচার তারা করেছে, শুধু মুখের কথায় তো আর সে সব অবিচার-অত্যাচার ধুয়ে যাবে না। আমার বৈধব্য সুনিশ্চিত জেনেও তারা আমায়—কিন্তু আমার নিজের অদৃষ্টে যখন বৈধব্য আছে, তখন তো তা ঘট্‌বেই। তারা উপলক্ষ বই তো নয়। বাপ-মা-হারা মেয়ের প্রতি এইরকম ব্যবহার শুধু তো আমার নিজের ব'লেই নয়, আরও কত হচ্ছে।... ...

দূর্ ছাই, এসব কথা আর কেন মনে করি। স্বামী যখন স্বর্গ থেকে দেখ্‌বেন তাঁর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার জন্যে আমি এইসব বিশ্রী অনুযোগ করছি, তখন তিনি কি ভাব্‌বেন? ভাববেন, তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা সব মিথ্যা—একেবারেই ভুয়ো।

না, কিছুতেই না এসব কুচিন্তাকে আমি প্রশ্রয় দোবনা, কিছুতেই না।... ...

দরজা খোলার শব্দে তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড়-চোপড় সাম্‌লে উঠে বস্‌লুম—কে, ঠাকুরপো?

বুকের আগুন

বিপিন একখানা চিঠি দিয়ে বল্লে,—তোমার নামের একখানা চিঠি। ব'লে চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক'দিন হ'ল কিরণদিদির চিঠিপত্র পাই নি। এ নিশ্চয় তারই চিঠি। কিন্তু চিঠি খুলেই বিস্মিত হলুম। তাড়াতাড়ি নীচের নাম দেখ্‌লুম—নিশীথ!...বুকের ভিতরটা কেন-জানি-না হঠাৎ দুরু দুরু ক'রে উঠ্‌ল। সে শব্দ যেন আমার কাণে এসে বাজ্‌ল। নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে চিঠিটুকু প'ড়ে ফেল্‌লুম। নিশীথ লিখেছে—

"কি ব'লে তোমায় সম্বোধন কর্‌ব তা আমি ভেবে পাচ্ছি না, তবু চিঠি না লিখেও থাকতে পার্‌লুম না। আমি এখন পাটনার হাসপাতালে। এখানে আজকাল কি-এক রকম জ্বর হচ্ছে, সেই জ্বরে আমায় ধরেছে! কেউ দেখ্‌বার নেই, কাজেই হাঁসপাতালে এসে থাকতে হয়েছে।

চিঠি দেওয়ার জন্যে আমার অপরাধ নিও না। আজ এই সাত-আট-মাস ধরে' আমি কারু কাছে কোনো দুঃখ-কষ্ট জানাই নি, এই অসুখে প'ড়েও জানাই নি। কিন্তু দু'দিন ধ'রে মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে-ক'রেও আমি তোমায় এ চিঠি না লিখে থাকতে পারলুম না। পাছে এ জ্বর আর ভাল না হয়, পাছে মার্‌বার সময় এই খেদ বুকে চেপে মর্‌তে হয়, সেই ভয়ে আমি থাকতে পার্‌লুম না। আশা করি, আমার আগের সে দোষও যেমন তুমি ক্ষমা করেছ, এটুকুও তেমনি কর্‌বে।... ...

এতকাল আমি দিশেহারা হ'য়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু যার জন্যে নিজের মাথার ওপর এ শাস্তি তুলে নিয়েছি, তাকে

ভুলতে পারিনি, বোধ হয় পারবোও না এ জীবনে! এ সংসার—এবং সেই সঙ্গে তুমি আমাকে যত বড় পাষণ্ডই মনে কর, তবু এ সত্যি কথা—এ সত্যি কথাটুকু স্বীকার ক'রেই আমার শান্তি! আমার নিজের মনকে কিছুতেই আমি বোঝাতে পারিনি! আমার মন বলে, কেন, এতে ত' কারু কোন ক্ষতি করছি নে! তবে যাকে ভেবে আমার এত সুখ, তার ভাবনা আমি কেন ছাড়ব?

আর বেশী কিছু লিখবনা। এ চিঠি প'ড়েই তুমি ছিঁড়ে ফেলো—তাতে আমার কোনো দুঃখ্যু নেই। কিন্তু যে কথা দিনরাত আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ী পিটুচে, সে কথা যে তোমার কাছে আমি নিবেদন ক'রে চললুম, তাই ভেবেই আমার মনে প্রবল তৃপ্তি! আর কিছু না!

আশা করি, তুমি ভাল আছ; ভগবান তোমায় সুখ দিন—শান্তি দিন!

—নিশীথ।"

চিঠিখানাকে কোলের উপর নিয়ে আমি যেন অচেতন হয়ে ব'সে রইলুম। এ আবার কি! এ কি আমার পরীক্ষা? এ সব কথা এতদিন পরে আবার আমার কাছে জানিয়ে নিশীথের কি লাভ? বাড়ীতে সে কোন খবর দেয়নি, কিন্তু আমি তার কে যে, আমার কাছে এত কথা লিখেচে? অনাথা বিধবার কাণে এ-সব পাপ-কথা শোনাবার তার কি দরকার? মনে করেছিলুম, না-জানি কি দারুণ অনুতাপেই সে দগ্ধ হচ্ছে! কৈ, তাতো নয়! যে মন নিয়ে সে সেদিন আমাকে রাঁচির গাড়ীতে তুলেছিল, সে মনের ভাব তার এখনো গেল কৈ? এত নীচ সে?

চিঠিখানাকে ছিঁড়ে ফেল্‌লুম। কিন্তু তখনি মনে হ'ল এ মিছে রাগ। যে সব আপত্তিকর কথা সে এই চিঠিতে লিখেছে, তা যে আমার মাথার ভিতর—প্রতি শোণিত বিন্দুটিতে নাচ্‌ছে! ক্ষতি যা' করবার তাতো করেছেই, এখন এ চিঠি ছেঁড়া বা না-ছেঁড়াতে তার কি আসে যায়? আবার চিঠিখানা জোড়া দিয়ে পড়্‌বার চেষ্টা করলুম। "যার জন্যে নিজের মাথার ওপর এ শাস্তি তুলে নিয়েছি, তাকে ভুল্‌তে পারিনি, বোধ হয় পার্‌বোও না এ জীবনে!...এ সত্যি কথাটুকু স্বীকার ক'রেই আমার শান্তি! যাকে ভেবে আমার এত সুখ, তার ভাবনা আমি কেন ছাড়্‌ব?"

এত কাতর মিনতিপূর্ণ কথা আমায় জানিয়ে তার তো কিছু লাভ নেই। বরং আমার সারা মন যেন বিষিয়ে উঠ্‌ছে। হাঁসপাতালে বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে সে আমাকে চিঠি লিখেছে! কেন? বাড়ীতে তো তার মা, ভাই, ভাজ, সব রয়েছে, তবে আমার ওপর এ অত্যা-চার কেন? তাদের চেয়ে কি আমি তার বেশী আপনার?

...কি আশ্চর্য্য! আমার নিজের মন তো আমার কম শত্রু নয়! ঐ কথাটা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আগের সে জ্বালা যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে!—কেন? সে আমার কে? তার প্রতি আমার কিসের দরদ?—তার ভাল-মন্দ হ'লে আমার তাতে কি আসে যায়?

ছিঃ, কি দরকার আমার ওসব কথা ভেবে?—না, আমি ওসব ভাববো না, কিছুতেই ভাববো না! তার প্রাণ যা চেয়েছে, তার যে রকম মন, সেই রকমই সে লিখেছে। তাতে আমি কেন নিজের মন তোলপাড় ক'রে মরি?

জোর ক'রে মনকে সেদিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আমার স্বর্গগত স্বামীকে চিন্তা করবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু শয়তান আমার বুকের মাঝে জেঁকে বসেছিল। সে কিছুতেই স্বামীর স্মৃতিকে সেখানে ঢুকতে দিলে না। চোখ বুজে শুয়ে রইলুম। সেই অন্ধকারের মাঝখানেও যেন মনে হো'ল ঐ নিশীথ শুয়ে রয়েছে! আমার মুখের পানে চেয়ে-চেয়ে কত কথা সে বল্‌তে চাচ্ছে! চম্‌কে চোখ খুললুম। উঃ, এ কি যন্ত্রণা! নিশীথ কি আমাকে বেঁচে থাকতে দেবে না? চোখের সাম্‌নে সেই সে-রাত্রির ট্রেনের ঘটনাটা ছবির মত নাচ্‌তে লাগ্‌ল। এমনি ক'রে আমি শুয়েছিলুম, আর সে ঐ পায়ের তলায় ব'সে পা-দুখানাকে তার কোলের ওপর চেপে ধ'রে কি কাণ্ডই না করছিল! তার আগে আমি সন্দেহও করিনি যে, নিশীথের মত ভালো ছেলে অমন পাপচিন্তা পোষণ করতে পারে! ভগবান্ তার ভেতর অত গুণ দিয়েছেন, অত বিদ্যে দিয়েছেন, তবু ঐ সর্ব্বনেশে ভাবনার আগুনে কেন সে তাকে পুড়িয়ে মারছে! কেন সে অমন ক'রে হা-ঘরের মত ঘু'রে বেড়াচ্ছে? নিজের মনের মত—নিজের পছন্দসই একটি মেয়েকে বিয়ে ক'রে কেন সে সংসারী হ'য়ে বস্‌ছে না? আমি বিধবা, আমার ভবিষ্যৎ এক বিরাট মরুভূমি—আমার চিন্তাকে সে কেন এমন ক'রে আঁকড়ে ধ'রে আছে? সে লিখেছে—চেষ্টা ক'রেও ভুলতে পারিনি! তা কি ঠিক? তাই যদি সত্যি হয়, তাহ'লে কি হবে?

কি আবার হবে? মরণ আর কি পাপিষ্ঠা! তোর এত ভাবনা কিসের? তোর নিজের ভাবনা কে ভাবে তার ঠিক নেই, তুই আবার পরের জন্যে মাথা ঘামাতে যাস্?

সেদিন সারাটা রাত ঘুম হো'ল না। মনের ভেতর সর্ব্বক্ষণ যেন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে তুঁষের আগুন জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। জোর ক'রে স্বামীর পানে মন ফেরাতে যাই, তাঁর কাছে বার-বার মাথা ঠুকে মার্জ্জনা চাই, কিন্তু তার পরের মুহূর্ত্তেই তাঁর ছবিকে কোথায় হারিয়ে ফেলি, আর খুঁজে পাইনে! তার বদলে নিশীথের সম্বন্ধে হাজার কথা জোয়ারের মত এসে আমায় একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।

তিন দিন এমনি ভাবে কাট্‌ল।

স্বামীর পায়ে মন নিবিষ্ট করবার হাজার রকম চেষ্টা ক'রে ক'রে মনকে অনেকটা শান্ত ক'রে আন্‌লুম। একদিন মনে হ'ল,—নিশীথ যা'ই করুক আর যা'ই লিখুক্, তার অসুখ, এ অবস্থায় তাকে একখানা চিঠি দেওয়া আমার উচিত নয় কি? তার অসুখ সম্বন্ধে শুধু দুটো কথা, আর কিছু না! তাতে দোষ কি? হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য আমি জয় করেছি। তবে আর শুধু ঐ দুটো কথা—সে কেমন আছে?—এটুকু লিখ্‌লে তাতে কি আমার পাপ হবে?

মন বল্‌লে, তাতে আমার কিছু পাপ নেই; যখন আমি কোন পাপ ইচ্ছা মনে রেখে এ চিঠি লিখ্‌ছি না।

দুদিন ধ'রে ভেবে ভেবে আমি এক দিন মন ঠিক ক'রে চিঠি লিখতে বস্‌লুম; অনেকগুলো কাগজ কাটাকুটি ক'রে—ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে শেষে একখানা লিখ্‌লুম,—"তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি অমন ক'রে আমায় কেন চিঠি লিখেছ? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি খুব শীগ্‌গীর ভালো হ'য়ে ওঠো।

—উমা।"

এইটুকুতেও কি দোষ হবে ? দূর হোক্ গে ছাই ! এত আর ভাবতে পারিনি। দোষ অ-দোষ তো আমার নিজের হাতেই। তাই ব'লে অমন অবস্থার চিঠি পেয়ে চুপচাপ্ ক'রে থাকা কোন মানুষেরই উচিত নয়। লোকে রাস্তার কুকুর-বেড়ালের ওপর কত মায়া দেখায়, আর আমি তার একটা খোঁজও নোব না ?...

ওকি ! নীচে অত গোলমাল হচ্ছে কিসের ? বিপিন কাদের সঙ্গে বকাবকি কর্‌ছে না ? তাই ত, এ যে অনেক লোকের গলা। আমি নীচে নেমে গিয়ে ঝিকে দিয়ে বিপিনকে ডেকে পাঠালুম ; ঝি বিপিনকে ডাকতে গেল ; সেই সময় বাইরে থেকে একটা গলা শোনা গেল,—"যান্, যান্, দয়া ক'রে আপনি একবার ভেতরে মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কখনই আমাদের শুধু হাতে ফেরাবেন না।"

এ কথাটার অর্থ তখন ঠিক বুঝতে পারলুম না ; কিন্তু পরে বুঝলুম। বিপিন ভেতরে আস্‌তে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কিসের গোল হচ্ছে ঠাকুরপো ?

বিপিন বিরক্তির স্বরে ব'লে উঠল, দেখ না বৌদি, এক দল ছোঁড়া এসেছে বাঁকুড়োর দুর্ভিক্ষের জন্যে চাঁদা আদায় কর্‌তে। তা আমি বল্‌লুম, কিছু হবে না। তা ওরা শুন্‌বে না। ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে বল্‌চে।

দুর্ভিক্ষ ? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সেদিন পড়ছিলুম বটে একখানা কাগজে, কোথাকার লোকেরা সব একদম খেতে না পেয়ে ম'রে যাচ্ছে, তাদের পেটে ভাত নেই, পরবার কাপড় নেই। মেয়েরা না খেতে পাওয়ায় তাদের মাইয়ের দুধ শুকিয়ে গেছে, ছোট-ছোট ছেলেগুলোও তাই

তাদের মায়ের কোলে শুকিয়ে মরছে! আহা! সেই দিনই আমার মনে হ'য়েছিল, যাদের খাবার অভাব নেই, বরং খুব বেশী পরিমাণেই আছে, তারা এদের খেতে দিচ্ছে না কেন?

বিপিনকে জিজ্ঞাসা করলুম, তা এরা কত চায় ঠাকুরপো?

বিপিন রাগ ক'রে বল্লে,—যত দিতে পারো; দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশো। ওদের পেট কি কিছুতে ভরবে?

আমি হেসে বললুম, তা হোক্, ও ভালো কাজ! ওদের পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দাও ভাই! এম্‌নি তো কতদিকে কত খরচ হচ্ছে—

বিপিন হাঁ ক'রে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। আমি বল্লুম, এই সেদিন ধান বিক্রী করার তো চার শো' টাকা এসেছে, পঞ্চাশটা টাকা তা থেকে দিলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

বিপিন ব'লে উঠ্‌ল, ক্ষতি হবে না? কি বল্‌ছ বৌদি! এরকম দু'হাতে খরচ করতে থাক্‌লে দু'দিনেই বিষয় নিলামে তুল্‌তে হবে যে! এতদিন আমি কিছুই বলিনি, কিন্তু আর না ব'লে থাকা উচিত নয়। এ টাকা আমি কিছুতেই দিতে পার্‌বো না।

তার কথা আমাকে যেন খুব জোরে একটা ধাক্কা দিলে। ঐ কথা বলেই সে চ'লে গেল। আমি থ' হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম; এমন সময় বাইরে থেকে একটী তের-চোদ্দ বছরের ছেলে এসে বল্লে,—হ্যাঁ মা, আপনার বাড়ী থেকে আমাদের শুধু-হাতে ফির্‌তে হবে?

আমার দু'চোখ ফেটে কান্না এল। টাকা তো আমার নিজের কাছে কিছুই নেই! কিন্তু এই ছোট ছেলেটী এমন ক'রে আমায় 'মা' ব'লে পরের জন্যে এই কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে, আর আমি কি ব'লে

বল্‌ব আমার হাতে কিছুই নেই! আর এরা সব পাড়ারই ছেলে, সে কথা বিশ্বাসই বা কর্‌বে কেন?

ছেলেটীকে বল্‌লুম, না, ফিরতে হবে না! একটু দাঁড়াও তুমি। ব'লে বরাবর উপরে গিয়ে আমি আমার হাতবাক্স খুলে একগাছি সোনার বালা নিয়ে এসে ছেলেটীর হাতে দিলুম। ছেলেটী আমার সামনে একখানি খাতা ও একটী পেন্সিল এগিয়ে দিলে। আমি লিখে দিলুম 'একগাছি সোনার বালা,' এবং নীচে আমার নাম সই ক'রে দিলুম।

তারা চ'লে গেলে আমি উপরে বিপিনের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্ব'লে যাচ্ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, বিপিন আর তার মা দু'জনেই হাজির। আমি বিপিনকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলুম, এ কথার মানে কি ঠাকুরপো? আমার স্বামীর টাকা, অথচ সে টাকা তুমি আমায় দিতে পার্‌বে না বল্‌ছ। কেন, সেটা শুন্‌তে পাই কি?

বিপিন একবার আমার পানে তাকিয়ে ঘাড় নীচু ক'রে ব'সে রইল। কিন্তু তার হ'য়ে তার মা উত্তর দিলে, তুমি ঝগড়া কর্‌তে চাও তো বল, আমাদের বল্‌বারও অনেক কথা আছে।

আমি জ্ব'লে উঠে বললুম,—বেশ, তাই; ঝগ্‌ড়াই আমি কর্‌তে চাই। আমি জান্‌তে চাই, আমার স্বামীর টাকা—

বিপিনের মা হঠাৎ চড়া গলায় ব'লে উঠ্‌ল,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার স্বামীর টাকা, কিন্তু তোমার টাকা নয়।

—আমার নয়? তবে কা'র?

আমরা উকিলের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছি, এ সব সম্পত্তি

আমার বিপিনের। তুমি এর কিছু পেতে পারো না, যা আমরা দিচ্ছি, সেটা দয়া ক'রে!

—কি রকম? সেইটাই শুনতে পাইনে জ্যাঠাইমা?

—শোনবার সাধ হ'য়ে থাকে ত' শোন। এ সম্পত্তিতে তোমার কোন অধিকার নেই। কেন না, স্বামী বেঁচে থাকতেই তোমার চরিত্র নষ্ট হ'য়েছিল, সে কথা টের পেতে একটুও আমাদের বাকী নেই, আর এসব কথা আমাদের উকীলকেও আমরা জানিয়েছি।...

আমার পায়ের নীচে ঘরের মেঝেটা যেন ভূমিকম্পে দুলতে সুরু করেছিল। তারই প্রবল ঝাঁকানিতে আমি সেইখানেই প'ড়ে গেলুম।

বিপিনের মার গলার স্বর কিন্তু তখনো আমার কাণে বজ্রধ্বনি ক'রে উঠল। নিশীথ ছেলেটি তোমার কে, এবং শচীকে দেখতে যাবার ছল ক'রে, দু'জনে কোথায় যাওয়া হয়েছিল, সে সব কথা কখনো লুকোছাপা থাকে না, আর তা নেইও। এখনো পর্য্যন্ত তার সঙ্গে চিঠিচাপুটী চলছে, তাও জানি। আমি তাই, সহ্য ক'রে নিয়ে আছি, নইলে যে শুনেছে সেই তো ছি ছি করতে কসুর করেনি।

চোখের ওপর থেকে জগতের সমস্ত আলো নিভে যেতে লাগল। কে যেন ঠেলতে-ঠেলতে আমায় কোন্ এক শূন্য অন্ধকারের গহ্বরে নিয়ে গিয়ে ফেললে। আমার নড়বার কোন শক্তিই যেন রইল না।

*　　*

*

আমি কলঙ্কিনী! নিশীথ—নিশীথ আমার...এতবড় প্রচণ্ড মিথ্যাকে এরা তাহ'লে সত্য ব'লে মনে স্থান দিয়েছে এবং সেই কথা উকীলের

কাছে বলেছে, দরকার হ'লে রাজ্য শুদ্ধ লোকের কাছে বল্‌তেও বোধ হয় এতটুকু কিন্তু করবে না!

এই কি আমার পুরস্কার? ঐ নিশীথের কথা মনে উঠ্‌লেও মনকে ধিক্কার দিয়ে বলি, এ চিন্তাও আমার পাপ! কিন্তু তার খুব প্রতিদান আমি পেলুম ত? আমার স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি—স্বামীর কোন জিনিষটীতে—এমন কি, এই বাড়ীতেও থাক্‌বার আমার অধিকার নেই! আমি যে কলঙ্কিনী—আমি যে ভ্রষ্টা!

উঃ! ভাব্‌তে-ভাব্‌তে আমি পাগল হয়ে যাবো না কি? কোনো দোষে আমি দোষী নই, তবু আমার এই দুর্নাম? এ সংসারে দুর্নাম থেকে রক্ষা করবার কেউ নেই, দুর্নাম দিতে অনেকে আছে।

এই যদি অবস্থা, তাহ'লে কিসের জন্য—কিসের আশায় আমার এই জীবন—এই যৌবনকে শুকিয়ে মারছি! বুকের ভিতর বাসনার অতৃপ্ত ক্ষুধা, এখনো সময়ে সময়ে প্রবল তেজে আমার বুকের মাঝে মাতামাতি করতে থাকে, দিনের পর দিন এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে তাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে মারতে যাচ্ছি কেন?...

এই রূপ, যে দেখেছে সেই প্রশংসা করেছে;—সেই রূপকে কি দুঃখে আমি এই সন্ন্যাসিনীর আভরণে চির-মলিন ক'রে রেখেছি? ভ্রষ্টাই যদি আমি, তাহ'লে যৌবনের এই পরিপূর্ণ সুধা আকণ্ঠ পান ক'রে নিই না কেন? নিশীথ—নিশীথ আমায় সত্যিই ভালবাসে, এখনো সে আমায় ভুলতে পারেনি, আমার জন্যে সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, বল্‌তে গেলে করেছেও তাই, তবু তাকে আমি ধরা দিই নি।...কেন দিয়নি? কেন?...

বুকের আগুন

কাল বিপিনের মায়ের ঐ কথা শুনে অবধি আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে দিনরাত কেবল ঐ সব কথাই ভাব্ছি! কিন্তু কেবল চিন্তা—চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়! এ বাড়ীতে তো আর আমি থাকতে পার্‌বো না; কিন্তু যাবো কোথায়? প্রভাতের বাড়ীতে গিয়ে কেঁদে পড়বো?—না। আত্মহত্যা কর্‌বো? কেন? কি দুঃখে?...

ঝি এসে বল্‌লে, একজন বাবু এসেচেন; আমার সঙ্গে দেখা করতে চান্। আমি তাকে লোকটির নাম জিজ্ঞাসা ক'রে আস্‌তে বল্‌লুম, কিন্তু নাম যা শুন্‌লুম, তাতে আমার হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটে উঠ্‌ল।

...কেন, কেন? হঠাৎ এই সময়টিতেই নিশীথ এখানে,—সে কি তবে সব কথা জান্‌তে পেরেছে? সে কি অন্তর্যামী?

একবার মনে হো'ল দেখা কর্‌বো না, কিন্তু সে কথা মুখ দিয়ে বেরুতে চাইলে না। ঝিকে বল্‌লুম, তাকে ওপরে নিয়ে আস্‌তে।

...কতদিন—কতদিন পরে তাকে দেখ্‌লুম! সে ঘরে ঢুক্‌তেই আমার দু'চোখ ফেটে জল এল। কিছুতেই নিজেকে সাম্‌লাতে পারলুম না। এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, এতদিন তাকে দেখ্‌বার জন্যেই আমার সমস্ত অন্তরখানি গুম্‌রে-গুম্‌রে উঠ্‌ছিল। এতদিনে বুঝতে পার্‌লুম, তাকে আমি কত ভালবাসি! এতদিনে বুঝতে পারলুম, সে আমার কে! বিপিনের মা মিথ্যে বলেনি,—সত্যই আমি কলঙ্কিনী, নিশীথ আমার সর্ব্বস্ব!

আমার চোখের জল দেখে নিশীথ প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল। কাছে এসে বল্‌লে—এ কি, চোখে জল কেন উমা?

আমার মুখে কোন কথা ফুট্‌ল না। চুপ ক'রে ব'সে ব'সে কাঁদতে লাগলুম। নিশীথ খানিক চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, তাহ'লে আমার ধারণা কি সত্যি উমা? উমা! আমি বিদেশে চাকরী পেয়েছি, ঠিক করেছি এবার বিবাহ করবো, আর এও ঠিক করেছি যে, বিধবা বিয়ে করবো! কিন্তু আমার এই সমস্ত সঙ্কল্প তোমার একটী কথার ওপর নির্ভর করছে।

আমার সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। ধীরে ধীরে আমার হাতের ওপর তার হাতের স্পর্শ অনুভব করলুম। সে আস্তে আস্তে আমাকে তার আরও কাছে আকর্ষণ করছিল; আমি তাড়াতাড়ি সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লুম,—আর আমি কিছু আপত্তি কর্‌বো না। তুমি যা' বল্‌বে তাই করবো, যা বল্‌বে তাই শুন্‌বো, কিন্তু এখান থেকে আগে নিয়ে চল আমায়। এ আমার স্বামীর বাড়ী, এখানে আমার জায়গা নেই!

নিশীথের কথা

আগে মনে করতুম, জীবনটা বুঝি চিরদিন একটানা নদীর মত বাধাবন্ধহীন সরল স্বচ্ছন্দ গতিতে কাটিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু হঠাৎ কোথা হ'তে কেমন করে যে স্বচ্ছন্দ নদীর বুকে প্রবল তুফান উঠ্‌ল, বুঝ্‌তেও পারলুম না। সেই তুফানের বেগ এতদিন আমায় কি নাস্তানাবুদ ক'রে না ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালে!

কিন্তু আজ—আজ সে ঝড়তুফান থেমে গিয়েছে; কালবৈশাখীর যে বিপুল মেঘসম্ভার স্তরে স্তরে আমার বুকের মাঝে জ'মে উঠেছিল, সে মেঘ কেটে গিয়ে যে কোনদিন স্বচ্ছ মুক্ত আলোক ফুটে বেরুবে, সে কথা কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। কিন্তু সে অসম্ভবও সম্ভব হ'য়েছে। আমার ধ্যান-কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী উমাকে আমি পেয়েছি—আমার নিজস্ব ক'রে পেয়েছি। সেই পাওয়ার আনন্দে আমার ইহকাল-পরকাল সফল হ'য়ে উঠেছে! স্বপ্নের রাণী আমার প্রাণময়ী হয়ে এই বুকের

মাঝে প্রেমের বন্দীত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। তাকে আমি হিন্দুমতে বিবাহ ক'রে আমার কর্ম্মস্থান পাটনার এক নিভৃত আবাসে প্রতিষ্ঠা করেছি!

আত্মীয় বান্ধব সমাজ আমাদের এ বিবাহকে কি চোখে দেখেছে, সে সমস্ত কথা ভাব্‌বার অবকাশ আমাদের নেই। আমাদের এই নিরবচ্ছিন্ন সুখের রাজত্বে এমন একটু অভাব, এমন একটু অবসরও নেই যে, বাইরের লোকের কথা আমরা ভেবে দেখ্‌ব। উমা স্বেচ্ছায় আমায় তার স্বামীত্বে বরণ করেছে, তার অমৃতময় হৃদয় রাজ্যে আমায় আধিপত্য দিয়েছে, এর চেয়ে আর বেশী কি আমার চাই? একটা জীবনে মানুষ এর চেয়ে আর কত বেশী সুখ-সম্পদ আশা কর্‌তে পারে? এর চেয়ে বেশী সুখ ধারণের স্থান কোথায়?...

আমাদের এ বিবাহের কথা বাড়ীতে বৌদিদির নামে একখানা চিঠি লিখে জানিয়েছিলুম। বৌদিদি কোন উত্তর দেন নি, কিন্তু দাদা লিখেছিলেন,—নিশীথ! আমি বড্ড সুখী হ'য়েছি! আজ আমি তোমার সব অন্যায়—সব অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌লুম। আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান্ তোমাদের সুখী করুন।

দাদার চিঠি পেয়ে আমার দুটী চোখ আনন্দাশ্রুতে ভ'রে উঠেছিল। দাদাকে যত ভক্তি করতুম, সে ভক্তি চতুর্গুণ বেড়ে গেল। চিঠিখানি উমাকে দেখিয়েছিলুম; তার চোখদুটিও সজল হ'য়ে উঠেছিল। সে বলেছিল, আমি মনে করেছিলুম, তিনি কখনই আমাদের এ বিবাহ সমর্থন কর্‌বেন না।

আমি আমার ব্যগ্র বাহুর বন্ধনে তাকে জড়িয়ে নিয়ে গর্ব্বভাবে

বলেছিলুম—আমার দাদার মন কখনো সঙ্কীর্ণ হ'তে পারে না। ব্যথিতের ব্যথা তিনি বোঝেন। ঐখানেই মানুষের দেবত্ব।

উমা আমার বুকের উপর মুখখানি গুঁজে অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বল্লে,—তা জানি, তিনি মানুষ নন্, দেবতা। বল্‌তে বল্‌তে তার দুটী চোখ ছাপিয়ে তপ্ত অশ্রুপ্রবাহ গড়িয়ে এসে আমার বুকের জামা ভিজিয়ে দিলে। আমি বিস্মিত হ'য়ে বললুম—কাঁদ্‌ছ কেন উমা?

উমা কোন উত্তর দিতে পারেনি। কেবল কেঁদেছিল। তার সেই অশ্রুসিক্ত মুখের উপর চুম্বনের পর চুম্বন দিয়ে বলেছিলুম, কেঁদোনা উমা! আমাদের কাঁদ্‌বার দিন তো ফুরিয়ে গেছে!

আমার পীড়াপীড়িতে সে শেষে মুখ তুলে আমার চোখের উপর তার সজল দৃষ্টি রেখে বলেছিল, এত সুখ আমার কপালে, তাই যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! পোড়াকপালী আমি—

আমি তার মুখ চেপে ধ'রে মৃদু ভর্ৎসনার হাসি হেসে বলেছিলুম, ও কথা বল্‌লে সত্যি বল্‌চি এমনি রাগ করবো! দুষ্টুমী?

আমার আদরে তার চোখের জলকে উজ্জ্বল করে হাসির বিমল দীপ্তি ফুটে উঠেছিল। সে যেন শারদ আকাশে বর্ষণের পর অরুণোদয়ের দীপ্তি!

সুখের দিনগুলি কেটে যাচ্চে জলের মত। আফিসে বসে যতক্ষণ কাজ করি, কেবলই মনে হয়, উমা আমার এতক্ষণ কি কর্‌ছে! চাকরাণীটা ঘুমিয়ে পড়েছে, একা না-জানি কত কষ্টই তার হচ্চে! আমারই মত সেও বোধ হয় একা বসে-বসে ভাব্‌ছে, আমার কথা! এই ক্ষণিকের বিরহে না-জানি সে কত অস্থিরই হচ্চে!

দিনান্তে কর্ম্মের বোঝা কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে দিয়ে যখন বাড়ী ফিরি, তখন পথের এই ব্যবধানটুকু যেন আর কিছুতেই শেষ হ'তে চায় না।...বাড়ীতে যখন এসে পড়ি, তখন হৃদয় যেন তার আনন্দ-চাঞ্চল্য নিজের মধ্যে ধ'রে রাখ্‌তে পারে না। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তার সামনে এসে দাঁড়াই, সেও একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে আমার তপ্ত আলিঙ্গনের মাঝে একান্তভাবে সমর্পণ ক'রে ব'লে ওঠে—আজ তোমার এত দেরী হ'ল যে ?

আমি হেসে বলি, পাগল ! দেরী কোথা ! দেখতো, ঘড়িতে সবে পাঁচটা বেজেচে ! সে ঘড়ির পানে তাকিয়ে লজ্জায় রাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। বুকের উপর মুখখানি লুকিয়ে বলে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, তুমি আজ অনেক দেরী করৃছ !

আমি কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে তার হাতের অমৃত-মাখানো জলখাবার আর চা খেতে বসি। সে আমার সামনে ব'সে বলে,—সত্যি, তুপুরবেলার এই সময়টা যেন আমার কিছুতেই কাটৃতে চায না। ঘুম যদি একটু আসে, তাও একটু পরেই ভেঙ্গে যায়। তখন উঠে ব'সে কেবল ভাবি, কতক্ষণে তুমি ফিরৃবে, আর কত দেরী !—সূয্যি দেখে আন্দাজ করি, মনে হয়, তোমার আসবার সময় হ'য়ে এসেছে, আর একটু পরেই তুমি আস্‌বে। কিন্তু তার কত পরে যে তুমি আস ! আমার কান্না পায় !...

সেদিন তার এই কথায় আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বলেছিলুম, বেশ, তোমার জন্যে আমি এইখানে একখানা ঘড়ি রেখে দোব। তাহ'লে আর এতটা কষ্ট হবে না। তারপর আমার প্রাণের কথা চেপে রাখ্‌তে

না-পেরে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলেছিলুম,—উমা, এত ভালবাসা তুমি আমার জন্যে কবে থেকে লুকিয়ে রেখেছিল? আজ তো তুমি আমার, আজ বল, বল্‌তে হবেই তোমায়, এ রত্ন-সঞ্চয় তুমি কবে থেকে সুরু করেছ!

তার মুখখানি টক্‌টকে লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। অসহ্য লজ্জায় সে ব'লে উঠ্‌ল,—তা আমি জানিনে। ওসব কথা আমায় জিজ্ঞেসা ক'রোনা। ওসব কথা মনে কর্‌তে গেলে আরও অনেক কথাই মনে পড়ে যায়!

আমি তাকে পাশটীতে টেনে নিয়ে নাছোড়বান্দার মত বলেছিলুম—কি কথা? বল, কি কথা মনে পড়ে যায়?

সে যেন অতিষ্ঠ হ'য়ে ব'লে উঠেছিল, তোমার পায়ে পড়ি, অমন ক'রে পেড়াপীড়ি করোনা তুমি! সে সব কথা বলবার নয়, সে কথা শুন্‌লে তুমি ত' সুখী হ'তে পার্‌বে না!

আমি সুখী হ'তে পার্‌বো না? কি এমন কথা? আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ অনেকখানি দ'মে গিয়েছিল। উমা কি তবে তার পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতির কালো ছায়া এখনো মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পারেনি? তাই কি? তাই কি?

সে বোধ হয় আমার মুখের ভাব দেখে ব'লে উঠ্‌ল, ঐত! তুমি রাগ করেছ! তাই বলছিলুম, ওসব কথা তুলোনা।···লক্ষীটি আমার, রাগ করোনা গো! সে মনের আগুন আমায় নিভিয়ে ফেল্‌বার সময় দাও একটু!

আমার মুখে কোন কথা ফুট্‌ল না। তাহ'লে ঠিক তাই! তাহ'লে উমা শচীবাবুকে এতখানি ভাল বেসেছিল যে,—না, এ তার জন্মগত সংস্কার?

উমা কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে বল্লে, তবু তুমি কথা ক'চ্ছনা? আমার ভালবাসায় তুমি সন্দেহ কর?—তুমি কি বিশ্বাস করো না যে, আমি তোমার, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব?

তার ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল আমার হাতের ওপর ঝ'রে পড়্ল। চমকে উঠ্লুম। সজল ম্লান মুখখানি তার দু'হাতে তুলে ধ'রে গদ্গদ্ হ'য়ে বল্লুম—কে বল্লে, আমি বিশ্বাস করি না? তোমায় আমি সন্দেহ ক'রতে পারি কি?

...না, ও কিন্তুকে আমি কিছুতেই মনে স্থান দোব না। উমার মনের ও একটা ক্ষণিক অবসাদ মাত্র! অতীতের এক টুকরো কালো ছায়া ছাড়া ও আর কিছুই নয়! সবই যখন হ'য়েছে, তখন ও ছায়াটুকু মিলিয়ে যেতে বেশীদিন লাগ্বে না। উমাকে যে আমি আমার বিবাহিতা পত্নীরূপে পেয়েছি, তার এই ব্যর্থ যৌবনের শুষ্ক মালঞ্চে প্রেমের মলয় সিঞ্চিত ক'রে যে তাকে কুসুমিত ক'রে তুল্তে সক্ষম হ'য়েছি, এই পরম সত্যই আমার সারা জীবনের গৌরব!

সমাজের যে লক্ষ লক্ষ নিরীহ বিধবা আজ চোখের জল আর বুকের আগুনকে সম্বল ক'রে মনে মনে মরণ কামনা করছে, তাদের ভিতরের অন্ততঃ একটী প্রাণীর জীবনকেও আমি সার্থক ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছি, সেইটুকুই আমার জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড় কাজ!

উমারও ঠিক ঐ মত। বিধবা-বিবাহের কথায় তার অদম্য উৎসাহ! সেদিন সে বলেছিল, ভগবান যদি কখনো আমাদের অনেক পয়সা দেন, তাহ'লে—

তাকে চুপ করতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম—তাহ'লে কি হয় উমা ?

উমা বলেছিল, তাহ'লে আমি এমন একটা কিছু করবো, যাতে এই বিধবা-বিবাহের কাজে অন্ততঃ একটা কণাও সাহায্য হ'তে পারে !

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তাহ'লে আমাদের এই বিবাহে তোমার আগাগোড়াই মত ছিল উমা ?

সে একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিল, না, তা ঠিক ছিল না ; বরং তার উল্টোই ছিল। কিন্তু যে সময়ে তুমি হঠাৎ বর্দ্ধমানের বাড়ীতে গিয়ে পড়লে, তখন আমার মনের এমনি অবস্থা—

সে থেমে পড়তে আমি বললুম, কি বল ?

সে বল্লে, আমার প্রাণের ভেতর তখন এমনি অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল যে, তোমায় দেখতে না পেলে আমি যে কি করতুম—কোথায় কোন্ কুৎসিত কলঙ্কের স্রোতে যে ভেসে যেতুম, সে কথা বলা ভারী শক্ত !...

উমার এই প্রাণের কথা শুনে সেদিন মনে মনে বলেছিলুম, এমনি মনের গতি কত শত বিধবার জীবনে হ'য়ে থাকে, তার কি কিছু ইয়ত্তা আছে ? আমরা—হিন্দুরা আজ ঐ কতকগুলো বড় বড় আদর্শের দোহাই দিয়ে মানুষের সহজ প্রবৃত্তি—এই সবচেয়ে উদ্দাম দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি যে কাম, তার সম্বন্ধে কি ভয়ানক ভাবে অন্ধ হ'য়ে চলেছি ! আমি হাজার-বার বলবো, এই সব অন্ধ গোঁড়ামির ফলে আমরা দিন-দিন যত নেমে যাচ্ছি, তত আর কিছুতে নয় ! মানুষই যদি আমরা না হ'তে পারলুম, তাহ'লে দেবত্বের ধুয়ো ধ'রে থেকে যে আমাদের কি উপকার হবে, তা তো আমি কোনো দিক দিয়ে ঠিক ক'রে উঠতে পারিনে !

একটা কথা উমা সেদিন বলেছিল, সেটা আমার ভারী মনে লেগেছে, আমাদের এই অন্ধ সংস্কারের কথা। জন্ম-জন্ম ধ'রে এই সংস্কার—মেয়ে আর পুরুষের পক্ষে বিবাহ বিষয়ে এই প্রভেদ-নীতির সংস্কার আমাদের এমনি আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, তা থেকে মনকে মুক্ত ক'রে তোলা যে কি করে সম্ভবপর হবে, তা ভেবে পাই না। পুরুষ—তা সে বৃদ্ধ হ'লেও ক্ষতি নেই—যখন এক স্ত্রীর বিয়োগে নির্ব্বিবাদে হাস্‌তে হাস্‌তে আর একটা মেয়ের পাণিগ্রহণ করে, তখন সেটা মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকে না, কিন্তু একজন যুবতী-বালিকা বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহে হৃদয় যেন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। উমা যে বলেছিল, তা বর্ণে-বর্ণে সত্যি! এর জন্যে কত যুগ ধ'রে কত লোককে নিজেদের বুকের রক্ত ঢালতে হবে, তবে যদি এর পরিবর্ত্তন হয়।

*　　*

*

অনেকদিন—প্রায় বছর দেড়েক কেটে গেছে। এতদিন আমরা দুজনে পরস্পরকে অবলম্বন ক'রেই দিন কাটাচ্ছিলুম, কিন্তু মাসকয়েক হ'ল আমাদের এই মিলন-নিকুঞ্জে এক নব-অতিথির আগমন-বার্ত্তা ভগবান্ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। স্বর্গের কোন্ দেবদূত সে, আমাদের দু'জনের বুকে নূতন আলোর বন্যা ছড়িয়ে দিতে আস্‌ছে? উমার মুখে-চোখে যেন একটা অভিনব দীপ্তি ফুটে উঠেছে; সে কি তার আসন্ন মাতৃত্বের উজ্জ্বল আভা?

ঐ সম্বন্ধে উমাকে যখন কিছু বল্‌তে যাই, তখন সে লজ্জার হাসি হেসে বলে, তোমার ভারী আনন্দ হচ্ছে, না? কিন্তু আমি যেন চেষ্টা ক'রেও তোমার মত আহ্লাদ করতে পারছি না! কেন, বল না?

আমি তার কথা অবিশ্বাসের হাসি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলুম, ওকথা শুন্‌তেই চাইনে আমি। মা হওয়ার চেয়ে বড় আনন্দ মেয়েমানুষের আর কিছু আছে নাকি?

সে আর কিছু না ব'লে চুপ করে গেল।

আমাদের এই অচেনা, অথচ চিরপরিচিত নূতন অতিথিটির আগমন যত আসন্ন হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, উমা দিন দিন ততই শীর্ণ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আমি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতুম,—তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ কেন বল ত?

উমা যেন চিন্তিতমুখে উত্তর দিত, তা তো ঠিক জানি নে। একদিন সে এই কথারই উত্তরে ব'লে উঠ্‌লো,—দেখ, আর বোধ হয় আমি বাঁচ্‌বোনা!

আমি তার মুখ চেপে ধরলুম। ভৎর্সনার স্বরে বললুম—দুষ্টুমী ক'রোনা উমা, অমন কথা ভুলেও মুখে আন্‌তে নেই।

তার পরের দিনই আমি একজন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করতে ছুটলুম। ডাক্তার হেসে বললেন,—কষ্ট না করলে কি আর মা হওয়া চলে ভায়া! ছেলের মুখ দেখ্‌তে হ'লে অমন একটুতে ভড়্‌কালে চলে না! এ অবস্থায় কোন মেয়ে দিব্যি মোটাসোটা হয়, কেউ আবার খুব শীর্ণ হ'য়ে যায়! এটা অস্বাভাবিক নয়।

আমি হাস্তে হাস্তে এই কথা উমাকে বল্তে সে বলেছিল, তুমি যেমন পাগল তাই ঐ কথা আবার ডাক্তারকে বল্তে গেছ!— আমার তো শরীরে কোনো কষ্ট নেই!

কিন্তু উমার এই শীর্ণতা আমার চোখে বড্ড কঠোর হ'য়ে দেখা দিচ্ছিল। থেকে-থেকে যেন তার মুখের ভাব দেখে আমি চম্‌কে উঠতুম!...

কৈ আজকাল ত' আর উমা তেমন ক'রে হাসে না, তেমন ক'রে পাগলটির মত কথা কয় না, তেমন ক'রে বুকে মাথা রেখে সোহাগে গ'লে যায় না! কেন?...

রাত্রে তার ঘুমন্ত মুখখানির পানে চেয়ে চেয়ে আমি কতদিন ঐ সব কথা ভেবেছি!

তার ভুবন-ভোলান ঐ চোখ-দুটীর কোলে কিসের একটা গভীর কালিমা ধীরে-ধীরে জমে উঠছে না? ভিতরে-ভিতরে উমা কি কোন যন্ত্রণা—কোন অসুখের কথা আমার কাছ থেকে গোপন ক'রে রেখেছে? সেদিন সে কথায়-কথায় হঠাৎ বলেছিল, 'আর বোধ হয় আমি বাঁচ্‌বো না!' তার ভেতর কি কিছু গভীর তাৎপর্য্য ছিল?— সন্তান প্রসবের কঠোর যন্ত্রণার জন্যই কি সে মনের ভিতর একটা ভয়ের ভাব পোষণ ক'রে রেখেছে? তাই বা আশ্চর্য্য কি? ডাক্তারেরা বলেন, নারীর পক্ষে এ একটা জীবন-মরণের ব্যাপার! তবে এতবড় ভয়াবহ ব্যাপারটাকে যে মানুষ সহজভাবে দেখতে পারে, সেটা কেবল ভগবানের আশীর্ব্বাদ! তাঁরই আশীর্ব্বাদে প্রতিদিন কত নারী এই জীবন-মরণ সমস্যা কাটিয়ে উঠ্‌ছে! তা, এই আশীর্ব্বাদটুকু থেকে

ভগবান্ কি আমাদেরই বঞ্চিত করবেন? তাঁরই দয়ায় আমি উমাকে পেয়েছি, আবার তাঁরই দয়ায়—

...এ কি! ঘুমুতে ঘুমুতে উমা এমন ক'রে চম্‌কে উঠ্‌লো কেন? কিছু স্বপ্ন দেখ্‌ছিল বুঝি? কিসের স্বপ্ন? দুঃখ না, আনন্দের? এ আবার কি? উমা আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল যে? আমি অস্থিরভাবে ডাকলুম,—উমা! উমা!

উমা যেন ধাঁপিয়ে উঠে চোখ চাইলে। মুহূর্ত্তমাত্র আমার মুখের পানে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে উদ্‌ভ্রান্তের মত হঠাৎ আকুলভাবে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠ্‌ল, ওগো আমাকে তোমার বুকে চেপে ধর, আমি তোমার বুকে মুখ লুকোই।

রুদ্ধনিশ্বাসে আমি তার মাথাটিকে আমার বুকের উপর চেপে ধরলুম, যত জোরে পারি! অনেকক্ষণ পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছিল উমা? স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে?

উমা বল্‌লে, হ্যাগো বড্ড দুঃস্বপ্ন!

—কি দুঃস্বপ্ন? আমায় বল, তুমি কেঁদে উঠ্‌লে কেন?

উমা প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলে উঠ্‌ল,—না না, সে কথা তুমি জিজ্ঞেসা ক'র না। মরে গেলেও সে কথা আমি বল্‌তে পার্‌বো না।

কি এমন খারাপ স্বপ্ন যে, উমা আমার কাছেও বল্‌তে পার্‌বে না? কোন প্রিয়জনের অমঙ্গলের স্বপ্ন? কিন্তু এ জগতে আমি ছাড়া উমার প্রিয়জন বল্‌তে তো কেউ নেই! তবে আর কি হ'তে পারে? বিদ্যুতের মত হঠাৎ আর একটা সন্দেহ আমার মনের ওপর দিয়ে

চ'লে গেল। যেমন মনে হওয়া অম্‌নি জিজ্ঞাসা করলুম,—কাকে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে উমা? শচীবাবুকে?

হঠাৎ চাবুক খেলে লোকে যেমন করে আঁৎকে ওঠে উমা ঠিক তেমনি করে আঁৎকে উঠ্‌ল।

আমার পানে সে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তার সে দৃষ্টি আষাঢ়ের আকাশের মত সজল হ'য়ে এল। আমার হাতখানি নাড়তে নাড়তে বল্‌লে আমার দোস নিও না তুমি। তুমি মনে করো না যে, আমি তোমায় কম ভালবাসি! আমি নিজেকে যত ভালবাসি, তার চেয়েও ভালবাসি তোমায়! কিন্তু আমার বুকের মধ্যে এ সব কি হ'তে আরম্ভ করেছে! এ ভূতের নৃত্য যে আর আমি সইতে পারি নে!

আমি বল্‌লুম,—কি স্বপ্ন তুমি দেখ্‌ছিলে উমা?

—তুমি রাগ করবে না ত?

—কেন রাগ করবো? বা-রে!

সে বল্লে,—স্বপ্ন দেখছিলুম সেই আমার আগের দিনের কথা। সেই বর্দ্ধমানের বাড়ী, সে আমায় কত আদর করছে... ...

বিকেলের দিকে তার জ্বর এসেছে, সে তার কাতর চোখদুটি আমার মুখের পানে তুলে নিতান্ত ছেলেমানুষটির মত বল্‌ছে, তুমি আমার কপালে একটু হাত বুলিয়ে দাও তোমার কোলে মাথাটি রেখে একটু ঘুমোই আমি।

—তারপর?

উমা বল্লে, তারপর তো ঠিক মনে নেই, আমার কোলে সে শুয়েছিল, কোথেকে যে কি-সব হয়ে গেল, সে কোথায় ছিট্‌কে চলে গেল, আমি কেঁদে উঠলুম। তারপর তোমার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখলুম, আমি তোমার কোলের ওপর শুয়ে। তখন সব কথা মনে পড়ে গেল।

আমার সমস্ত হৃৎপিণ্ডটা বেদনায় টন্ টন্ করে উঠ্‌ল। এর তাৎপর্য্য কি? এ কি সেই সংস্কার, যার কথা উমা বলেছিল। না এ তার চেয়েও বেশী, তার প্রেম?

প্রকাশ্যে উমাকে বল্‌লুম, তাহ'লে তুমি ঐ সব কথা আজকাল খুব বেশী ভাবো বুঝি?

উমা বল্‌লে,—না, আমি তো ভাবি না কিন্তু যখনি একলা থাকি, তখনি যেন কত ছবি আমার চোখে ভেসে ওঠে। তার ভিতর বেশীর ভাগই দেখি, তাকে। সে যেন আমার কাণে কাণে কেবল ঐ এক কথা বলে, উমা তুমিই আমার সব। বেঁচে থাকতেও ঠিক অমনি করেই সে বলত কি না। সত্যিই সে তো কিছু জান্‌তো না; আমি কোন কাজটি না করে দিলে সে কাজ তার পড়েই থাক্‌ত, কখ্‌খনো করা হোত না। সে আমার চেয়ে বয়সে কত বড় ছিল, তবু এমনি ছেলেমানুষী সে করত, তোমায় কি বল্‌বো।

কথাগুলো বল্‌তে বল্‌তে উমা যেন কেমন তন্ময় হ'য়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ আমার একটা কথা মনে হ'য়ে গেল, উমা কি তবে এই সব চিন্তার চাপেই দিন দিন এমনি শীর্ণ হ'য়ে পড়্‌ছে?

সে আমার মুখের পানে চেয়ে আমার একখানি হাত তার বুকের উপর টেনে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বল্‌লে—এ আমার কি ছিষ্টিছাড়া মন, বলে দিতে পারো আমায়? সে যখন চলে গেল, তখন সেই নিঃসহায় অবস্থায় পড়ে পড়ে কত কথা মনে হোত। তখন তার কথার চেয়ে অন্য সব কথাই আমার বেশী মনে হোত! কিন্তু এখন—এখন আমি তোমায় পেয়ে এত সুখে আছি, তবু এ বুকের আগুন নিভ্‌তে চাচ্ছে না কেন?

আমি বল্‌লুম, তাঁকে তুমি বড্ড ভালোবাস্‌তে কি না! বল্‌তে বল্‌তে আমার গলা ভারী হ'য়ে এল, সেটা নিজেই বুঝ্‌তে পারলুম।

উমা কিন্তু তা লক্ষ্য না করে বল্‌তে লাগ্‌ল—কি জানি। আমার মনে হয় আমার চেয়ে সেই বেশী ভালবাস্‌ত! অমন করে সে যদি না আমায় ভালবাস্‌ত, তাহ'লে এসব কথা বোধ হয় আমার মনে আস্‌ত না! তার সেই রোগের দিনগুলি মনে পড়্‌লে আমার মনের ভেতর কি যে ঝড় বইতে থাকে! সেই কাশ্‌তে কাশ্‌তে অবসন্ন হ'য়ে আমার কোলের ওপর এলিয়ে পড়া, সেই একটু পথ্যের জন্যে আমার মুখ চেয়ে থাকা, আমি খাইয়ে দিলে কি তৃপ্তিভরে সে খাওয়া! সে সব কি আমি কোনোদিন ভুল্‌তে পারবো? চেষ্টা তো এত করি, কৈ ভুল্‌তে তো পারিনি! তুমি রাগ কর্‌বে, রাগও যদি না কর, মনে ভয়ানক দুখ্যু কর্‌বে তা জেনে-শুনে আমি নিজের মন ঠিক করবার কত চেষ্টা করেছি, তবু পারিনি! আমি বুঝ্‌তে পারছি, তুমি রাগ কর্‌ছ, কিন্তু কেন তুমি নিজে থেকে এ বিষের ভাণ্ডার ঘাঁটিয়ে তুল্‌লে? আমি তো পুড়্‌ছি, কিন্তু তোমার মনটাকেও যে আমি বিষিয়ে তুল্‌লুম!

মনের ভাব চেপে জোর করে বাধা দিয়ে বল্‌লুম—আচ্ছা, আচ্ছা, কি পাগলের মতন বকছ বল ! সত্যিই তুমি পাগলী !

কিন্তু মন যে আমার সত্যিই বিষিয়ে উঠেছিল, সে কথা তো নিজের কাছে অস্বীকার করবার ক্ষমতা আমার নেই ! কেবল যেন মনে হয়, তবে কি ভুল করলুম ? তবে কি উমা আমার কাছে যে আদর-সোহাগ, ভালবাসা দেখায়, সে সমস্তই অভিনয় ? সত্যই কি সে আমাকে—যত দেখায়, ততটা না হোক্—এক বিন্দুও ভালবাসে না ?

এই সন্দিগ্ধ অন্তরকে কত বোঝাবার চেষ্টা করি, না-ই বা বাস্‌লে, আমার নিজের এ ভালবাসার মধ্যে ত কার্পণ্য নেই, আমি তো আমার সমস্ত হৃদয় আমার রাণীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছি ! তার বিনিময়ে না-ই কিছু পেলুম, তাতেই বা ক্ষতি কি ? কেন, তাই বা কেন ? পেতেই বা বাকী কি ? উমা মুখে যে ভালবাসা আমার কাছে নিবেদন করে, তাতে অবিশ্বাস করবার কোন প্রকৃত হেতুই তো আমার নেই ! তার ঐ অনুপম রূপরাশি, ঐ সুরভিত যৌবন-শ্রী, সমস্তই সে আমার সেবায় অর্পণ করেছে ! ভালই যদি সে আমায় না বাস্‌বে, তা'হলে এ বিবাহ সে কেন করতে গেল ? এর জন্য কত লোকের চোখে সে কলঙ্কিনীও হয়েছে। তা সত্ত্বেও জেনে শুনে সে এ পথে কেন অগ্রসর হবে ? না, অবিশ্বাস আমি তাকে কিছুতে করতে পারবো না। তবে তার হৃদয়ে শরতের মেঘের মত ঐ যে চিন্তারাশির ছায়াপাত হচ্ছে, ঐ সামান্য কারণে যদি আমি চঞ্চল এবং সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠি, তাহ'লে এই বিধবা বিবাহ করতে যাওয়াই আমার উচিত হয়

নি! মনের এটুকু সহিষ্ণুতা যার নেই, তার আবার সমাজের চোখে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধর্‌বার ধৃষ্টতা কেন?

কিন্তু দিন যত যেতে লাগল, উমার সম্বন্ধে দুর্ভাবনা আমার মনে ততই প্রবল হ'তে লাগ্‌ল। বুঝ্‌তে পার্‌লুম, তার দুশ্চিন্তাকে সে কোনক্রমেই ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারছে না এবং তারই শোষণে তার শরীরের রক্ত ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে। তার গায়ের রং এমনি ফ্যাকাশে হ'য়ে যাচ্ছে যে, হঠাৎ চোখে পড়লে তাকে চিনে-ওঠাও দুঃসাধ্য মনে হয়। আমার বুকের উপর যেন দিনের পর দিন এক ভীষণ পর্ব্বতভার জমা হ'য়ে উঠ্‌ছে। মনে হয়, আমি একা—নিতান্ত নিঃসহায় ভাবে একা, আর সাম্‌নে অদূরে বিপদের ঐ ভীম সাগর-কল্লোল শুন্‌তে পাচ্ছি, এ অবস্থায় আমি কেমন করে কি কর্‌ব! উমাকে কোন কথা বলে লাভ নেই, সে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার মুখের পানে চেয়ে বলে—তুমি আজকাল এমন হ'য়ে যাচ্ছ কেন? পায়ে পড়ি তোমার, অমন করে তুমি দিনরাত ভেবোনা! এমনি আরও কত কি আবোল-তাবোল সে ব'কে যায়, অনেক সময় যার অর্থ সংগ্রহও হয় না। আমি কখনো তাকে আদর করে, কখনো কৃত্রিম বিরক্তি দেখিয়ে চুপ কর্‌তে বলি। রাত্রে আমার বুকের খুব কাছে মাথা রেখে সে কথা কইতে কইতে যখন অবসন্ন হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ে, আর আমি নির্নিমেষ নয়নে তার পানে চেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবি, তখন তার ঘুমন্ত মুখখানির উপর চুম্বনের অজস্রধারা বর্ষণ কর্‌তে কর্‌তে চোখের জলও সহস্রধারায় তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হয়ত কোনদিন সে ধড়মড় করে জেগে ওঠে; আমার আত্মসংবরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা আমায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

সেদিন সকালে ডাক্তার এসেছিল। উমা বিছানার উপর কাৎ হ'য়ে শুয়েছিল। আমার বিশেষ পীড়াপীড়ীতে পড়ে ডাক্তার তাকে ভাল করে দেখে বল্লেন,—হ্যাঁ, বড্ডই Anæmic হ'য়ে পড়েছেন বটে! এখন খুব তাজা বাতাস আর পুষ্টিকর খাদ্য বিশেষ করে প্রয়োজন। কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে রাখ্‌তে পারেন না ?

আমি বল্‌লুম, এই অবস্থায় ?

ডাক্তার বল্‌লেন, তাতে কি হ'য়েছে ? কোন পাহাড়ী জায়গায় কিম্বা সমুদ্রতীরে ; ধরুন, কাছাকাছি এই দেওঘর, শিমুলতলা, কিম্বা পুরী, এই সব জায়গায়। সেইখানেই না হয় delivery হবেন, তার আর কি ?

আরও গোটাকতক উপদেশের পর ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। উমা মাথার কাপড় খুলে আমার একখানি হাত টেনে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বল্‌লে,—আমার একটা কথা রাখ্‌বে ?

—কি কথা উমা ?

সে আগ্রহের সঙ্গে আমার মুখের পানে চোখ রেখে বল্‌লে, আমায় পুরীতে নিয়ে চল, আমি পুরীতেই যাবো।

আমি তার কপালের উড়ো চুলগুলি গুছিয়ে দিতে দিতে বললুম, —বেশ ত, তোমার যদি তাই ইচ্ছা হয়, তাই নিয়ে যাবো।

সে আর কোন কথা না বলে পাশ ফিরে নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে রইল।

চাকরটা এসে বল্লে, ডাক্তারবাবু ফিরে এসে আমায় ডাক্‌ছেন। আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলুম। ডাক্তারবাবু বল্‌লেন,

—আপনার তো দেখ্‌চি বাড়ীতে আর কোন স্ত্রীলোক নেই। ওঁর কাছে এখন আপনার কোন আত্মীয়াকে এনে রাখ্‌তে পারেন না?

আমার মুখে হঠাৎ কোন উত্তর জোগাল না। তার পর বললুম, দেখি চেষ্টা করে।

ডাক্তারবাবু চলে গেলে বসে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, এমন কে আমার আছে যে, এই বিপদের দিনে এসে সাহায্য করবে? দাদার চিঠিতে শুনলুম, মা কাশীবাস করতে যাচ্ছেন; অনুমানে বেশ বুঝতে পারছি, এই বিয়ের পর থেকে আমার ওপর তিনি খুব বেশী বিরক্ত হয়েছেন। আমার বোনেরা শ্বশুরবাড়ীতে, তাদের এখন এখানে আসতে বলা, সেটা কি ভাল দেখাবে? বিশেষ, সমাজের চোখরাঙ্গানির ভয়ে আমি এ পর্য্যন্ত কারু কাছে কখনো কোন আবেদন-নিবেদন জানাই নি, আজ যদি জানাতে যাই, এবং আজ—উমার এই অবস্থায় যদি কোনরকম কুৎসিত গোলযোগ এই নিয়ে ওঠে, তাহ'লে সে ধাক্কা হয় ত উমাকে আরো ভয়ানক ভাবে অবসন্ন করে ফেল্‌বে। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলুম, বৌদিদির কাছে আমি সকল অবস্থার বর্ণনা দিয়ে এক্ চিঠি লিখ্‌ব, এবং তিনি যাতে দাদাকে জানান, সে কথাও লিখ্‌ব। দাদা তো আমাদের উপর অসন্তুষ্ট নন, তিনি কি যাহোক্ একটা সুব্যবস্থা করে দেবেন না?

সেই দিনই রাত্রে যখন আহারাদি শেষ করে শয়ন করেছি, তখন হঠাৎ উমা যেন কি-একটা তন্ময়তা থেকে নিজেকে জোর করে টেনে তুলে জিজ্ঞাসা করলে' তুমি কি ভাব্‌ছ? আমায় হাওয়া খেতে নিয়ে যেতে হবে না তোমায়! আমার তো কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হবে না!

বিস্মিত হ'লুম। বললুম, সে কি! সকালে যে তুমি পুরী যেতে চাইলে উমা?

উমা যেন শিউরে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি বল্‌লে, পুরী? সত্যিই তুমি আমায় পুরী নিয়ে যাবে বলে ঠিক করছ? তুমিও কি আমায় মেরে ফেল্‌তে চাও? পরে হঠাৎ একবারে দু'হাতে আমার পা দুটো চেপে ধরে বলে উঠ্‌ল,—না গো না, আমায় পুরী নিয়ে যেও না! সেখানে গেলে আমি আর একটা দিনও বাঁচবো না!

একটা আকস্মিক অগ্নিশলাকা যেন আমার বুকের একদিক হ'তে আর একদিক পর্যান্ত পুড়িয়ে দিয়ে চ'লে গেল। পুরী! পুরী! সেই-জন্যই উমা তখন পুরী যেতে চেয়েছিল? এবং সেইজন্যই এখন আর যেতে চাচ্ছে না?

ভগবান্! ভগবান্! এই তীব্র বহ্নিজ্বালা বুকে চেপে রেখে উমা আমার ক'দিন বাঁচ্‌বে? কেন তার এই কঠোর শাস্তি? কেন? কেন? কোন্ অপরাধে সে অপরাধী?

চোখের জল উমার শুষ্ক পাণ্ডুর কপোল বেয়ে অত্যন্ত নীরবে গড়িয়ে আস্‌ছিল। আমি আমার মুখের উপর সেই মুখখানি টেনে নিয়ে অশ্রুতে অশ্রু মিশিয়ে শুধু বললুম, উমা!—আর কিছু না। আর একটা বর্ণও আমার মুখ থেকে বেরুল না।

অনেকক্ষণ পরে উমা আস্তে আস্তে উঠে ব'সে বল্‌লে,—আমি কোথাও যাবো না, যদি বাঁচি এইখানেই বাঁচব। তুমি তো কত করছ, আমার কপালে এত সুখ সইছে না বলেই বোধ হয় যম আমায়

টান্ছে। লক্ষ্মীটি, অমন করে ভেবোনা, আমার মনই আমার শত্রু, তা তুমি কি কর্‌বে বল!

*　　*

*

দাদা আমার চিঠি পেয়ে একজন নার্সকে সঙ্গে করে এখানে এসে-ছিলেন, এবং সব অবস্থার খোঁজ নিয়ে নার্সকে প্রয়োজন মত ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন।

যথাসময়ের পূর্ব্বেই—ন'মাসে—একটী খোকার আবির্ভাব হ'ল। তখন শেষরাত্রি, কিন্তু আমার চোখে নিদ্রার লেশমাত্র ছিল না। আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বাইরে থেকে নার্সকে জিজ্ঞেস করলুম, উমা কেমন? নার্স বল্লে,—ভালই। ব্যস্ত হ'বার কোন কারণ নেই।

কিন্তু এটা যে নিতান্তই নীরস স্তোকবাক্য, সে কথা পরে বুঝ্‌তে পারলুম। ভোরের সময় নার্স এসে আমায় বল্‌লে,—একবার ডাক্তারের বাড়ীতে খবর দিতে হবে। বৌদিদির জ্ঞান হচ্ছে না ত?

আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক্তারের বাড়ীতে ছুট্‌লুম।

তারপর? তারপর প্রায় পনের দিন ধরে সে কি অবিশ্রাম সংগ্রাম! উমার জ্ঞান আর কিছুতেই ফির্‌তে চায় না। দিনের পর দিন—রাত্রির পর রাত্রি—আহার নেই, নিদ্রা নেই বল্লেও হয়—কেবল যমে আর মানুষে অশ্রান্ত যুদ্ধ! আমি আমার সর্ব্বস্ব পণ করেছি আমার উমাকে বাঁচাবার জন্যে! নার্সকে বলেছি, যেমন করে লোক